লুঠের পঞ্চায়েত

অধিকার পুনরুদ্ধারের লড়াই

গণশক্তি

লুঠের পঞ্চায়েত
অধিকার পুনরুদ্ধারের লড়াই

জানুয়ারি ২০১৮

প্রকাশক
অভীক দত্ত
গণশক্তি ট্রাস্ট
৭৪এ, এ জে সি বোস রোড
কলকাতা - ৭০০ ০১৬

প্রচ্ছদ
মনীষ দেব

মুদ্রক
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি.
৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য : ২০ টাকা

পঞ্চায়েত। গ্রামের সরকার। স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বেও একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে এই প্রসঙ্গ। অনেক দেশনায়ক বলেছিলেন 'গ্রাম স্বরাজ'-র কথা। কিন্তু স্বাধীন ভারতকে সফল পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সাক্ষী হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় একতিরিশটি বছর। মানুষের আশা, অংশগ্রহণে মূর্ত পঞ্চায়েত মাথা তুলেছিল সংগ্রামী পশ্চিমবঙ্গে – ১৯৭৮-এ।

স্বাধীন ভারতের গণপরিষদে উত্থাপিত খসড়া সংবিধানে পঞ্চায়েতের কোনও উল্লেখই ছিল না। দীর্ঘ বিতর্ক হয়। তারপর কিছুটা অবজ্ঞাভরেই সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির পাতায় জায়গা পায় পঞ্চায়েত। যদিও সংবিধানের সেই ধারার প্রতিও কোনও শ্রদ্ধা না দেখিয়ে ১৯৫২-তে চালু হয় সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী। সেই ব্যবস্থা ছিল উপর থেকে বসিয়ে দেওয়া আমলা-নিয়ন্ত্রিত কর্মসূচী। ফলে ব্যর্থ হয়। পাঁচের দশকে গান্ধীবাদী নেতা বলবন্ত রাও মেহতার সভাপতিত্বে সরকার একটি কমিটি করে। সেখানে পঞ্চায়েতের প্রসঙ্গ ছিল। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন হয় ১৯৫৬-তে। দ্বিতীয় দফার আইন হয় ১৯৬৩-তে। ১৯৬৩-তেই দিবাকর কমিটি মন্তব্য করেছিল যে, গ্রাম সভায় জনগণের উপস্থিতি নগণ্য। গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণের জন্য বাস্তব পরিস্থিতি ছিল প্রতিকূল। কারণ রাজনৈতিক উদ্যোগের ঘাটতি ছিল এবং সেই সঙ্গে ছিল শ্রেণী-বিভক্ত ও জাতপাত-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা।

অর্থাৎ মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগই দেওয়া হয়নি। যা হওয়ার তাই হয়েছে। আমলা-সর্বস্ব ব্যবস্থা, তা সফল হতে পারে না। হয়ওনি। ফলে পঞ্চায়েতের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৭৩-এ নতুন একটি পঞ্চায়েত আইন হয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। নির্বাচন হয়নি। যদিও ওই আইনে দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে, কাঠামোগত ও প্রয়োগ সংক্রান্ত অনেকগুলি বাধাও ছিল।

রাজ্যের মানুষ বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৭৭-এ। ১৯৭৮-এ পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়, জুন মাসে। দিন যত এগিয়েছে, বোঝা গেছে ১৯৭৩-র ওই আইন যথেষ্ট নয়। তাই বারবার সংশোধন করতে হয়। প্রধান সংশোধনীগুলি গৃহীত হয় ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯৪ এবং ২০০৩-এ।

পঞ্চায়েতে তফসিলী জাতি, আদিবাসী ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ শুরু হয় ১৯৯৩ থেকে। ভূমিসংস্কারসহ বামফ্রন্টের বিভিন্ন কর্মসূচীর ইতিবাচক প্রভাবে ততদিনে পিছিয়ে থাকা অংশের মানুষ দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছেন। ১৯৯৮-এ সেই সংরক্ষণ আরও বিস্তৃত হয়। সভাপতি, সহ-সভাপতির পদও সংরক্ষিত হতে শুরু করে সেই সময় থেকে।

ভূমিসংস্কার : সফল পঞ্চায়েতের ভিত্তি

''আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি ১৯ লক্ষ একর জমিতে ফসল হয়। তার মধ্যে ১৮ লক্ষ একর জমিতে দুই ফসল হয় এবং ১ কোটি একর জমিতে এক ফসলের বেশি হয় না। এখানেও আপনারা কিছু করতে পারেননি, কই, এদিকে তো নজর গেল না। আপনারা অথচ বারেবারে বলছেন লোক বাড়ছে, ইস্টবেঙ্গল থেকে লোক আসছে।...আপনারা বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু এভাবে তো ভূমিসংস্কার সত্যি হবে না, এভাবে চাষিকে জমি দেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র জমিদারী ক্রয় করে নিলেই হবে না।''

উপরের বাক্য কটি প্রায় ষাট বছর আগে রাজ্য বিধানসভায় উচ্চারিত হয়েছিল। সেদিন ছিলো ২৫শে জুলাই, ১৯৫৮। বিধানসভার বাইরে তখন দুর্বার আন্দোলন মাথা তুলছে। কৃষক সংগ্রাম তার অক্ষশক্তি। বিধানসভার মধ্যে তার কণ্ঠস্বর ছিলেন কমিউনিস্টরাই। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্কট বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিলো সেদিন। আর সেখানেই, ওই ভাষাতেই দেশের শাসক শ্রেণীর সুখের ঘর বারান্দা সবলে, স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিলেন এক কিংবদন্তী কমিউনিস্ট – তিনি কমরেড জ্যোতি বসু।

বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভূমিসংস্কার গ্রামের আর্থিক পরিবেশ বদলে দিয়েছে। মানুষকে অধিকার সচেতন করেছে। সেই গ্রামবাসীরাই পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। গ্রামে খাস জমি চিহ্নিত করা, তা ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে সংশোধিত আইন অনুসারে প্রধান দায়িত্ব রয়েছে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির।

বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের সময়কালকে বারবার হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে তৃণমূল কংগ্রেস। এই সময়ে প্রায় ১৪ লক্ষ ৪ হাজার ৯১ একরের বেশি জমি খাস হয়েছে। তার মধ্যে কৃষিযোগ্য জমি ১৩ লক্ষ ১৪ হাজারের বেশি। কৃষি ও কৃষিযোগ্য মিলে সারা দেশে খাস হয়েছে ৬৯ লক্ষ ৩ হাজার ৯০৪ একর জমি। অর্থাৎ সারা দেশের

২০ শতাংশের বেশি জমি খাস হয়েছে এই রাজ্যে। অথচ সারা দেশের কৃষি জমির মাত্র ৩ শতাংশের অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ। জমিদারদের মামলার কারণে মূলত আদালতে বিচারাধীন বলে বিলি করা যাচ্ছে না প্রায় ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪৯৫ একর জমির পাট্টা। তবু ২০০৮-র সেপ্টেম্বরের হিসাবে সারা দেশে ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে জমি বন্টিত হয়েছে ৫১ লক্ষ ৮১৭ একর। সেই জায়গায় রাজ্যে ঐ সময়ে বন্টিত হয়েছে ১১ লক্ষ ২৪ হাজার ১৪২ একর। সারা দেশের ৫৪ শতাংশের বেশি পাট্টাদার এই রাজ্যে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা ২৯ লক্ষ ৮৫ হাজারের বেশি। এদের মধ্যে তফসিলী জাতিভুক্ত মানুষ প্রায় ১১ লক্ষ ১০ হাজার। আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার জন পেয়েছেন পাট্টা। তফসিলী জাতি এবং আদিবাসীরা মিলে মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। অবশ্য ভূমিসংস্কারের ফলে বিলি হওয়া পাট্টার ৫৫ শতাংশ পেয়েছেন তফসিলী জাতি ও আদিবাসী অংশের মানুষ। সংরক্ষিত নন যাঁরা তাঁদের প্রায় ২৭ শতাংশ সংখ্যালঘু। কিন্তু সংরক্ষিত নন যাঁরা তাঁদের মধ্যে বন্টিত জমির ৩৬.২৪ শতাংশ পাট্টা পেয়েছেন সংখ্যালঘুরাই। প্রায় ৪ লক্ষ ৯০ হাজার সংখ্যালঘু পাট্টা পেয়েছেন।

অধিকার পেয়েছেন মহিলারাও। রাজ্যে যৌথ পাট্টার অধিকারী ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৯৮৭টি পরিবার। অর্থাৎ পরিবারের জমিতে মহিলা-পুরুষের সমান অধিকার। আবার স্বামীর মৃত্যু হলে জমির অধিকারী হন স্ত্রীরাই। কিছু ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে। পাশাপাশি ২০০৮-র সেপ্টেম্বরের হিসাবে এছাড়াও রাজ্যের ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৮৩৭ জন মহিলা একাই জমির মালিক। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১লক্ষ ৬২ হাজারের বেশি। এই সব মিলিয়ে রাজ্যে বন্টিত মোট জমির প্রায় ৩০ শতাংশের অধিকারী মহিলারই।

পঞ্চায়েত, ভূমিসংস্কারের সুফল

১৯৭৩-'৭৪ সালে দেশের গ্রামবাসীদের ৫৬.৪ শতাংশ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করতেন। পশ্চিমবঙ্গে এই হার ছিল ৭৩.২ শতাংশ। ১৯৭৩ থেকে ২০০৫-র মার্চ পর্যন্ত দেশে সবচেয়ে দারিদ্র কমেছে কেরলে। দ্বিতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। এই পরিসংখ্যান রাজ্য সরকারের নয়। ২০০৭-এ জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৬১তম রাউন্ডের ফলাফল প্রকাশ করে ভারতের প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো। ১৯৯৪-র সাহা-স্বামিনাথানের রিপোর্ট বলছে ১৯৮১-'৮২ থেকে ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে ৬. ৯ শতাংশ। ধারেকাছে কেরালা ছাড়া আর কোনো রাজ্য নেই। বলাবাহুল্য ভূমিসংস্কার রাজ্যে অনেক মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়েছে। যা একই সঙ্গে উৎপাদন বাড়িয়েছে আবার চাহিদাও বাড়িয়েছে। কারণ সারা দেশে যেখানে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের হাতে মোট জমির মাত্র ৪৩ শতাংশ রয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৮৪ শতাংশ জমির মালিক ঐ অংশের কৃষকরা। এইসবের সম্মিলিত ফলাফল রাজ্যে ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে আম জনতার।

ভূমিসংস্কার আর ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে একে অপরের পরিপূরক, সামগ্রিকভাবে গ্রামের অভূতপূর্ব বিকাশের প্রধান উপাদান

বিকশিত গণতন্ত্র

বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে পঞ্চায়েত তো বটেই, অনেক পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা জেলা পরিষদ বিরোধীরা চালিয়েছে। কখনও তা মুর্শিদাবাদ, কখনও দক্ষিণ ২৪ পরগনা কিংবা পূর্ব মেদিনীপুর। বামফ্রন্ট সরকার সেগুলি কোনও দিন ভাঙার চেষ্টা করেনি। সি পি আই(এম) কখনও বিরোধীদের ভোটে জেতা সদস্যকে কোনও কৌশলেই ভাঙিয়ে আনার চেষ্টা করেনি। এখানেই সবচেয়ে বড় পার্থক্য তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে বামফ্রন্টের মধ্যে ধরা পড়েছে গত সাত বছরে।

কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের জনপ্রশাসনের শতবার্ষিকী অধ্যাপক প্রভাত দত্ত। ২০১২-র এপ্রিল সংখ্যার 'পঞ্চায়েতী রাজ' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধটির শিরোনাম 'গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণ'। তার ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে তিনি লিখেছেন, ''পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নেতৃত্বে আছে গরিব মানুষের প্রতিনিধি। এদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভারতবর্ষে নজিরবিহীন। ১৯৭৮-'৮৩ সালে পঞ্চায়েতে বর্গাদারদের শতকরা হার ছিল ১৮ শতাংশ। ভূমিহীনসহ ৩ একরের জমি মালিকদের প্রতিনিধিত্ব ছিল ২১.৮ শতাংশ। ১৯৮৮-'৯৩ সালে এই প্রতিনিধিত্ব বেড়ে বর্গাদারদের ক্ষেত্রে হয় ৩.১৭ শতাংশ এবং ভূমিহীনদের ক্ষেত্রে হয় ৩০.১৭ শতাংশ। ফলে এ রাজ্যে ঘটেছে অবদমিত মনুষত্বের বিকাশ। সম্ভবত এ এক ধরনের 'শূদ্র জাগরণ'।'' পঞ্চায়েতে গণ অংশগ্রহণে দেশে পশ্চিমবঙ্গ পথপ্রদর্শক – এ' কথা বললে তৃণমূলীরা, কংগ্রেসীরা চিৎকার করে ওঠেন।

উল্লেখ্য, গ্রাম সভার মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গে গুরুত্ব পায় ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের আগেই – ১৯৯২ সালে তৈরি হয় গ্রাম সংসদ। সংবিধান সংশোধনের বাধ্যবাধকতার জন্য পঞ্চায়েত আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন হয় ১৯৯৪ সালে।

অর্থাৎ পথ দেখিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

মাত্র সতেরো বছরে ছবিটি কী দাঁড়ালো? ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর দেখা গেলো তিনটি পর্যায়ে নির্বাচিত হলেন ৫১,৪৯৯ জন। জেলাগুলিতে মোট ৪১,৮৮৪ জন পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন সেবার। তাঁদের মধ্যে সংখ্যালঘু ছিলেন প্রায় ২৪ শতাংশ – মোট ৯৭৩৫ জন। পঞ্চায়েতে তফসিলী জাতিভুক্ত সদস্য ছিলেন ১৪,৫৭১ জন। আদিবাসী ছিলেন ৩৩৯২ জন। পঞ্চায়েতগুলিতে মহিলা সদস্য ছিলেন প্রায় ১৫০০০। এছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত ৮,৮৬০ জনের প্রায় ২২ শতাংশ, সংখ্যালঘু

ছিলেন। জেলা পরিষদের ৭৫৫টি আসনের মধ্যে ২১.৩২ শতাংশ ছিলেন সংখ্যালঘু। তিনটি পর্যায় মিলিয়ে পরিচালনাকারীদের মধ্যে ১০,৮৩৯ জন সংখ্যালঘু মুসলিম।

যাঁরা ছিলেন পিছিয়ে, তাঁরা ততদিনে এগিয়ে আসতে পেরেছেন অনেকটা। মানুষের পঞ্চায়েত গড়ে উঠেছে, বিকশিত হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে।

গ্রামোন্নয়নের অনুগঠক পঞ্চায়েত

১৯৭৮-এর আগে কি পরিস্থিতি ছিল গ্রামের?

বিধানসভার কার্যবিবরণীতে পাওয়া যাচ্ছে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র বাজেট ভাষণের একটি অংশ। ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮। অশোক মিত্র বিধানসভায় জানাচ্ছেন যে, রাজ্যের গ্রামঞ্চলে খেতমজুর প্রায় ৪০ লক্ষ। তাঁদের মাথাপিছু দৈনিক রোজগার ৩৫ পয়সা! ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট 'কাজের বদলে খাদ্য' প্রকল্প চালু করে। সরকারী রিপোর্ট বলছে ১৯৭৭-র সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর – এই দু'মাসে ঐ প্রকল্পে রাজ্য সরকার ৬৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৭টি শ্রমদিবস তৈরি করেছিল। মজুরি বাবদ ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল। দেওয়া হয়েছিল ২৪ হাজার ৮০৪ টন গম। সর্বাধিক শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছিল অবিভক্ত ২৪ পরগনায়।

বদলে গেছিল গ্রাম।

কতটা? দ্বিতীয় ইউ পি এ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা শিশির অধিকারী। ২০১০-এ ওই মন্ত্রক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। নাম – 'পভার্টি ইরাডিকেশান ইন ইন্ডিয়া বাই ২০১৫, রুরাল হাউসহোল্ড সেন্টার্ড স্ট্রাটেজি পেপার'। সেই রিপোর্ট বলছে ১৯৭৩ সালে দেশে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিলো প্রায় ৩২ কোটি ১৩ লক্ষ। এর মধ্যে ২৬ কোটি ১৩ লক্ষ জন গ্রামে থাকতেন। অর্থাৎ সারা দেশে কংগ্রেস-বিজেপি শাসনে গ্রামীণ দারিদ্র বিশেষ কমেনি। ওই রিপোর্টই বলছে দেশের দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী গ্রামবাসীদের ৭৬.২ শতাংশ ৯টি রাজ্যে থাকেন। এই রাজ্যগুলি হলো – উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, বিহার, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ।

পরবর্তীকালে নজর কেড়ে এগিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

কেন্দ্রের ওই রিপোর্ট বলছে – ১৯৭৩ থেকে ২০০৫, এই সময়ে এই রাজ্যে দারিদ্র কমেছে। ১৯৭৩-'৭৪ সালে এই রাজ্যের গ্রামবাসীদের ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৯৬ হাজার জন দারিদ্রসীমার নিচে বাস করতেন। দেশের মোট গ্রামবাসীদের তাঁরা ছিলেন ৯.৯ শতাংশ। ২০০৫-এর মার্চ পর্যন্ত পরিসংখ্যান বলছে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি সত্বেও এই রাজ্যে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী গ্রামবাসীর সংখ্যা ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ২২ হাজার। সারা দেশের গ্রামবাসীদের মধ্যে তাঁরা ৭.৮ শতাংশ। অথচ এই একই সময়ে সারা দেশে

বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা সহ প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। সরল পাটি গণিত বলছে – একই সময়ে সারা দেশে দারিদ্র্য কমেছে ৬ কোটির কিছু বেশি মানুষের। একা পশ্চিমবঙ্গে কমেছে প্রায় ৮৫ লক্ষ।

ফলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গরিব, পিছিয়ে থাকা মানুষের অংশগ্রহণও বেড়েছিল।

উন্নয়ন মানে কী? এই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে সি পি আই(এম)-র অবস্থান এবং তৃণমূল কংগ্রেস ও বি জে পি-র ধারনা এক নয়। তফাৎ অনেক। ইচ্ছা মত নির্মাণ কাজ, তাতে নীল-সাদা রঙ করা, নির্বাচনের আগে যেমন খুশি বিলি বন্টনই উন্নয়ন বলে তৃণমূল কংগ্রেস মনে করে। বি জে পি-রও মনোভাব প্রায় তাই।

সি পি আই(এম) কী মনে করে?

সি পি আই(এম) পশ্চিমবঙ্গ একবিংশতিতম সম্মেলনের 'বামফ্রন্ট সরকার ও আমাদের কাজ' শীর্ষক প্রস্তাবে স্পষ্ট বলা হয়েছিল –''পুঁজিবাদের স্বাভাবিক এবং অনিবার্য প্রতিক্রিয়াকে এড়িয়ে জনগনতান্ত্রিক বিপ্লব ব্যতিত রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক এমনকি বাম ও গনতান্ত্রিক ফ্রন্টের কর্মসূচীতে প্রদত্ত কোন বিকল্পের ধারনা বাস্তবানুগ নয়। পার্টি কর্মসূচীতে উল্লিখিত 'বিকল্প নীতি' প্রণয়ন ও রূপায়ণের বামফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে এই ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে সর্বাপেক্ষা দুর্বলতর অংশকে যাথাসম্ভব রক্ষা করার দায়িত্ব বামফ্রন্ট সরকার অস্বীকার বা অবহেলা করতে পারে না।''

এই 'দুর্বলতর' অংশকে যতদূর সম্ভব রক্ষা করাই ছিল বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পঞ্চায়েতগুলিও সেই সময়ে এমনই অভিমুখে পরিচালিত হয়েছিল।

দারিদ্র দূরীকরণ, মানবোন্নয়ন সূচকের নিরিখে গোটা দেশে অগ্রণী জায়গায় পৌঁছেছিল পশ্চিমবঙ্গ। অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলির নীতির পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করতে করতেই বামফ্রন্ট সরকার এগিয়েছে। সারা দেশজুড়ে আর্থিক-সামাজিক-আঞ্চলিক- লিঙ্গ বৈষম্য তীব্র গতিতে বাড়ছে। বামফ্রন্ট সরকার আছে বলেই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং উদারনীতির যাবতীয় খারাপ প্রতিক্রিয়া থেকে পশ্চিমবঙ্গ মুক্ত থাকবে – এমন ধারণা কোনদিনই সি পি আই(এম)-র ছিল না। তাই শুধু ভাতা কিংবা সাইকেল দেওয়াতেই সরকারের কাজ থেমে ছিল না। গ্রামের আরও বিকাশ, কৃষির নির্দিষ্ট উন্নয়ন, গ্রামের পরবর্তী প্রজন্মের কাজ, চাকরি, ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল শিল্পের উপর। তাই স্লোগান ছিল – 'কৃষি আমাদের ভিত্তি/শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'।

বামফ্রন্টের সময় কেমন পঞ্চায়েত চালাতো তৃণমূল

বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ পরিচালনা করত তৃণমূল কংগ্রেস। ২০০৮-র পর পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পরিষদও তারা দখল করে। বামফ্রন্ট কখনও সেই জেলা পরিষদগুলি ভাঙার চেষ্টা করেনি।

২০১২-১৩'-র বাজেট উপলক্ষ্যে রাজ্যের জেলা পরিষদগুলি কেমন কাজ করেছিল, তা স্পষ্ট করতে তালিকা বানিয়েছিল রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। এগারোটি প্রকল্পে কাজের বিচারের পর মমতা ব্যানার্জির সরকার নম্বর দিয়েছিল জেলা পরিষদগুলিকে। প্রথম স্থানে ছিল বর্ধমান জেলা পরিষদ। দ্বিতীয় স্থানে যৌথভাবে ছিল বীরভূম এবং উত্তর ২৪ পরগনা। জলপাইগুড়ি ছিল চতুর্থ স্থানে। হুগলী, নদীয়া, হাওড়া, বাঁকুড়া ছিল যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম স্থানে। এই সব কটি জেলা পরিষদই ছিল বামফ্রন্ট পরিচালিত।

নবম স্থানে রয়েছে তৃণমূল পরিচালিত পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ। তৃণমূল পরিচালিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা ছিল ১৮ নম্বরে।

মমতা ব্যানার্জির মুখ্যমন্ত্রিত্বের এক বছরের মাথায়, ২০১২-র মার্চে জেলাগুলির স্বমূল্যায়ণ প্রকাশ করে রাজ্য সরকার। তার আগেই উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ – তিনটি জেলা পরিষদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল মমতা ব্যানার্জির সরকার। তিনটিই বামফ্রন্ট পরিচালিত ছিল। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের রিপোর্টই জানায়, গ্রামোন্নয়নের কাজে রাজ্যে তখন দু' নম্বরে ছিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ। প্রথম স্থানাধিকারী ছিল বর্ধমান। সেটিও পরিচালনা করত বামফ্রন্টই। নদীয়া ছিল ৬ নম্বরে। নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া অপর জেলা পরিষদ মুর্শিদাবাদ ছিল ১৩ নম্বরে। উল্লেখ্য, ২০০৯-'১০ সালে জেলা পরিষদগুলির কাজের পর্যালোচনা হয়েছিল। সেই পর্যালোচনাতেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ১৮ তমই ছিল। অর্থাৎ দু'বছরে, কোনও সরকারের আমলেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদে কাজের হাল আদৌ ফেরেনি।

প্রকল্পভিত্তিক মূল্যায়ণ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। যেমন – ইন্দিরা আবাস যোজনা। রাজ্য সরকারের জানিয়েছিল তখন সেই কাজে নদীয়া ছিল প্রথম স্থানে। দ্বিতীয় পুরুলিয়া। তৃতীয় দক্ষিণ দিনাজপুর। চতুর্থ বীরভূম। পঞ্চম জলপাইগুড়ি। আর দক্ষিণ ২৪ পরগনার অবস্থান ১৫ নম্বরে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় রাস্তা তৈরির কাজে রাজ্যে প্রথম ছিল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া। চতুর্থ স্থানে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ রয়েছে নবম এবং দশম স্থানে। আর তৃণমূল পরিচালিত পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার অবস্থান যথাক্রমে ১৩ এবং ১৮ নম্বরে।

প্রতিটি প্রকল্পেই তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদের অকর্মণ্যতা স্পষ্ট মমতা ব্যানার্জিদের ওই রিপোর্টে।

'পরিবর্তন'-র পঞ্চায়েত : গণতন্ত্রের প্রহসন

২০১১-র মে-তে সরকার গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেস।

পঞ্চায়েত সংক্রান্ত এই সরকারের প্রথম পদক্ষেপ ২৬শে মার্চ, ২০১২। প্রথম পদক্ষেপেই মমতা ব্যানার্জি বুঝিয়ে দিলেন তাঁর পথ কোনটি। সেদিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা কেড়ে নেয় রাজ্য সরকার। যা তার আগের ৩৪ বছরে কখনো হয়নি। শুধু উত্তর ২৪ পরগনাই নয়, সেই অনাচারের শিকার হয়েছিল মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলা পরিষদও।

মুখ্য সচিবের পক্ষ থেকে জারি করা সেদিনের নির্দেশ (১৯৫৯/পি এন/ও/১/৩বি-২/২০১২) অনুসারে, 'কার্যকরীভাবে ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৭৩-র ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্টের ২১২ ধারা অনুসারে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের টাকায় পরিচালিত যাবতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব জেলা শাসক তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসারকে অর্পণ করা হলো।'

নির্বাচিত প্রতিনিধি, সংস্থাকে অগ্রাহ্য করা, মানুষের মতামতকে পদদলিত করা এবং বিরোধীদের কার্যত উৎখাত করার রাজনীতির স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে সেদিনই।

মমতা ব্যানার্জি গ্রামোন্নয়নের যাবতীয় দায়িত্ব থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরিয়ে আমলাদের দায়িত্ব দেওয়া শুরু করেন গোড়া থেকেই। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ বাধ্য হন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখতে। অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী এসবের তোয়াক্কা করেননি।

দখলের পথেই শুরু

মমতা ব্যানার্জির শাসনে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৩-র জুলাইয়ে। রাজ্যের মোট ৪৮৮০০টি পঞ্চায়েতের আসন। নির্বাচনের আগেই, আতঙ্ক সৃষ্টি করে ৫৩৫৬টি আসন দখল করেছিল তৃণমূল। পঞ্চায়েত সমিতির ৯২৪০টি আসনের মধ্যে ৮৭৯টি আসনেরও একই কায়দায় দখল নিয়েছিল শাসক দল। রাজ্যে ১৭টি জেলা পরিষদের মোট আসন ৮২৫টি। তার মধ্যে ১৫টি আসনও একই কায়দায় দখল করেছিল তৃণমূল। তারপরও যেগুলিতে নির্বাচন হয়েছিল, সেগুলিতে দেদার ছাপ্পা, ভোট লুঠ, বিরোধীদের মেরে বের করে দেওয়া, বুথ দখল করে পঞ্চায়েত দখল করতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। পাঁচ দফা নির্বাচন শেষে ফলপ্রকাশ ৩রা আগস্ট। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ''এই জয় গণতন্ত্রের জয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির জয়।''

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বুথ দখল-ছাপ্পা ভোট-ভোট লুট করেই তৃণমূল জয়ী হয়েছিল ৫১ শতাংশ আসনে। সতেরোটার মধ্যে তেরোটা জেলা পরিষদ দখল করে। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের প্রায় অর্ধেক আসনেই তৃণমূল হেরে গিয়েছিল। তাদের জয় হয়েছিল ৫১ শতাংশ আসনে। তার মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা সাড়ে পাঁচ হাজার

আসনও রয়েছে। সেগুলি বাদ দিয়ে হিসাব করলে সোজাসুজি ভোটে লড়াই করে তৃণমূল জিতেছিল মাত্র ৪৫ শতাংশ আসনে। আবার এই শতাংশের হিসাবে বুথ দখল, ব্যাপক ছাপ্পা ভোট এবং গণনার সময় ভোট লুটের হিসাবও থাকছে।

তবু বামফ্রন্ট জয়ী হয়েছিল ১৫,৫৯৩টি আসনে। শতাংশের বিচারে ৩২ শতাংশ। কংগ্রেস ৫৫০৬টি আসনে। শতাংশের বিচারে ১১ শতাংশ।

যদিও গত পাঁচ বছরে বেশিরভাগ পঞ্চায়েতই বিরোধীদের থেকে দখল করে নিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। কোথাও ভয় দেখিয়ে, কোথাও লোভ দেখিয়ে, কোথাও অন্য কোন কৌশলে।

দল ভাঙিয়ে দখলদারি পঞ্চায়েতে

২০১৩ সালে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিলো শাসকদল তৃণমূলের তীব্র সন্ত্রাস আর আক্রমণের মধ্যে। পুলিশ প্রশাসনের মদতে জোর জবরদস্তি, ভয় আর প্রলোভন দেখিয়ে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান দখল করেছে শাসক দল। তা সত্ত্বেও ১৩টির বেশি জেলা পরিষদে সরাসরি জয়লাভ করতে পারেনি তৃণমূল। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদে তৃণমূল জিততে পারেনি। একইভাবে বহু পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতেও বিরোধীদের জয় হয়েছিলো। কিন্তু তাতে কি! নির্বাচনের পরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শুরু হয় নতুন খেলা। গরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য এমন সব ঘৃণ্য প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেওয়া হয় যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শুধু নতুন নয়, শিউরে দেওয়ার মতন।

দল ভাঙিয়ে পঞ্চায়েতের তিন স্তরেই দখলদারি শুরু হয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়াটি হলো নির্বাচিত সদস্যকে প্রাণে মেরে দেওয়া। সন্ত্রাসের পর্ব পেরিয়েই যেখানে বামপন্থীরা পঞ্চায়েত গঠন করেছিল, অঙ্ক কষে সেখানে খুনও করা হয়েছে। সভাপতি হিসাবে কাজ শুরুর আগেই নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম গাজিকে। পাটিগণিতের অঙ্কে সংখ্যা কমিয়ে এরপর সেই সমিতি দখলও করেছিলো শাসকদল। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফারাক্কায় খুন হন পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্য হাসমত শেখ। জনগণের রায়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েও পঞ্চায়েত সমিতি দখলের জন্য খুনের রাজনীতি শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূলের দখলের সবচেয়ে বড় উদাহরণ রয়েছে মুর্শিদাবাদে। ২০১৩-তে অনেক চেষ্টা করেও মানুষের ভোটে মুর্শিদাবাদ জেলায় দাগ কাটতে পারেনি তৃণমূল। ভোটের নিরিখে তাদের জনভিত্তি ছিল বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের তুলনায় অতি সামান্য, তারা ছিলো তৃতীয় স্থানে। নির্বাচনী ফলাফলে তৃণমূল ২৫০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে মাত্র ৮টি পঞ্চায়েতে জয়ী হয়েছিল। সেই তৃণমূল এখন জেলায় ১৭৫টি পঞ্চায়েতে রাজত্ব চালাচ্ছে। গোটা জেলায় ২৬টির মধ্যে ১টি মাত্র পঞ্চায়েত সমিতি সাগরদিঘিতে জয়ী

হয়েছিল তৃণমূল। এখন তৃণমূলের দখলে ১৮টি পঞ্চায়েত সমিতি। আর জেলা পরিষদ? মোট ৭০টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জয়ী হয়েছিল মাত্র ১টি আসনে। বাকি সবই ছিল বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের হাতে। এমন জেলা পরিষদেও তৃণমূল দখলদারি কায়েম করেছে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মোট ৪২ জনকে ভাঙিয়ে নিয়ে। মোট ৪৩ জনকে নিয়ে এখন মুর্শিদাবাদের জেলা পরিষদ তাদের হাতে। তৃণমূলের এই গোটা দখলদারির প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছিল যার হাত ধরে, সেই মুকুল রায় এখন তাদের দলে নেই। আছেন বিজেপি-তে। কিন্তু তৃণমূলের অন্য নেতারা একই 'ফরমুলা'য় এগিয়েছে।

দল ভাঙিয়ে দখলদারির এই ফরমুলা বা সূত্র মালদহ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর ইত্যাদি বহু জেলাতেই হয়েছে। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনেও মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায় তাদের রমরমার মধ্যেও এখানকার বেশিরভাগ বিধানসভা আসনই বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের হাতে ছিল। সেই কারণেই আরও বেশি করে পঞ্চায়েত ও পৌরসভা দখলে নামে তৃণমূল। গত এক বছরের মধ্যে প্রায় বুলডোজার চালিয়ে কাজটি সম্পন্ন করে ফেলেছে তারা। দলবদলের এমন আজব খেলা দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছেন জেলার মানুষ।

খুন, হামলা, রক্তপাত – ফ্যাসিবাদী কায়দা

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকে ফল ঘোষণার পরবর্তী একমাসের মধ্যে সিপিআই(এম)-র ১৪ জন কর্মী শহীদ হয়েছেন। ১ জনকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছে। ধর্ষিতা হয়েছেন ১০ জন। শারীরিকভাবে নিগৃহীতা বা লাঞ্ছিতা হয়েছেন ৯৩ জনের বেশি। নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরবর্তী একমাসে ২১৫১ জন নেতা-কর্মী-সমর্থক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে হয়তো সারা জীবন পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে, এমনভাবে আঘাত করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় আক্রান্ত হয়েছেন বামফ্রন্টের নবনির্বাচিত বিধায়করাও। হলদিয়ায় সিপিআই(এম) বিধায়িকার বাড়িতে হামলা হয়েছে। বিভিন্ন স্তরের পার্টি অফিস আক্রমণ, ভাঙচুর বা দখল করা হয়েছে। সি পি আই (এম)-র ৬৮৪টির বেশি পার্টি অফিস দখল, ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। তাছাড়া বামপন্থী গণসংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নের ১৩৫টি অফিস একইভাবে দখল বা ভাঙচুর অথবা আগুন লাগানো হয়েছে।

সি পি আই (এম)সহ বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির নেতা-কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে অজস্র মিথ্যা মামলা দায়ের করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সি পি আই (এম)-র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদককেও মিথ্যা অভিযোগে মামলা দায়ের করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পার্টির রাজ্য সম্পাদক সূর্য মিশ্রের ওপরেও হামলা হয়েছে। এছাড়াও

মানুষের জীবনজীবিকার ওপর বিভিন্নভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক দেশে সুবিচার ও আক্রান্তের ভরসাস্থল হওয়ার কথা পুলিস। আইনের শাসনের ভিত্তিতে কাজ করতে গেলে শাস্তি ও হুমকির মধ্যে পড়তে হয় পুলিস-প্রশাসনের কর্মী ও অফিসারদের। তাদেরও আত্মসমর্পনে বাধ্য করা হচ্ছে। পুলিস, প্রশাসনিক ব্যবস্থাটাকেই তৃণমূল কংগ্রেসের বশংবদ, দলদাসে পরিণত করা হয়েছে। নিরপেক্ষতার নীতি অনুসারে ন্যূনতম কাজ করার চেষ্টা হলে সেই অফিসারদের জায়গা হচ্ছে আস্তাকুঁড়ে। তাই পুলিসের আইনী শাসন রক্ষার মেরুদন্ড অন্তর্হিত। ফলে থানায় অভিযোগ করা হলে উলটে অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হচ্ছে। অভিযোগকারীর বাড়িতে আবার আক্রমণ করা হচ্ছে।

বসিরহাটের পানিগোবড়া গ্রাম তৃণমূলী বর্বরতা একটি নিদর্শন হয়ে রয়েছে। তৃণমূলী আক্রমণে জনশূন্য হয়ে যায় পানিগোবরা গ্রাম। একের পর এক বাড়িতে সেখানে আগুন লাগিয়ে ঘরছাড়া করা হয়েছে গ্রামবাসীদের। জ্বলে গেছে গরিবের সর্বস্ব। সারারাত গ্রামের মহিলারা পাটখেতে লুকিয়ে রাত কাটিয়েছেন। শিশুদের মুখে কয়েকফোঁটা জল ছাড়া কিছু দিতে পারেননি। গ্রাম ঘিরে তাণ্ডব চালানোর পাশাপাশি তৃণমূলের বাহিনী রাস্তা অবরোধ করে পুলিস ও সাংবাদিকদের পথ আটকেছে। বসিরহাট থানার পুলিশ মার খেয়েছে। কতটা বেপরোয়া শাসক দল – বসিরহাট তার প্রমাণ। ময়ূরেশ্বরের ঢেকা অঞ্চলের বটনগর গ্রামে এক ক্যান্সার আক্রান্ত মহিলার উপর হামলা চালাতেও পিছপা হয়নি তারা। আক্রান্ত পরিবারের অভিযোগ, আমরা এই নির্বাচনে তৃণমূলকে ভোট না দেওয়াতেই এই আক্রোশ। তাই বদলা নেওয়ার জন্যই এই হামলা। মেদিনীপুরে এক চিকিৎসকের চেম্বার ভাঙচুর হয়েছে। রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় কলের লাইন, বিদ্যুতের লাইন নষ্ট করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। ভেঙে দিয়েছে কল। কেন? সেই সব জায়গায় বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। তাদের কর্মীদের শাসানি –''আমাদের হারিয়েছিস। যা এবার তোদের এমএলএ-কে বলে জল বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে নে।''

বোলপুরসহ রাজ্যের কিছু জায়গায় গ্রামবাসীরা দেখেছেন বাড়িতে হামলা চালানোর পর ছাত্রীর সাইকেল নিয়ে চলে গেছে লুঠেরাদের দল। কেন? সেই ফ্যাসিবাদী প্রবণতা –''আমরা সাইকেল দিয়েছিলাম। ভোট দিসনি। সাইকেল নিয়ে গেলাম।'' এখন তৃণমূল সরকার কন্যাশ্রী আর সাইকেল বন্টনের সাফল্য নিয়ে গলা ফাটাচ্ছে। কিন্তু এই কন্যাশ্রী এবং সাইকেল নিয়ে তৃণমূল ভোটের আগে কীভাবে প্রচার করেছে? একেবারে ফ্যাসিবাদী কায়দাতেই হুমকি দিয়েছিলো তারা। বীরভূমে তৃণমূল নেতাদের ভোটপ্রচারে মাইকে বলতে শোনা গেছে, যে বুথ এলাকায় তৃণমূল জিতবে সেখানে আরো অনেক উন্নয়নের ঢালাও ব্যবস্থা করা হবে। আর যেখানে জিতবে না, সেখানে সবুজসাথীর সাইকেল ফেরৎ নিয়ে নেওয়া হবে। রেশন কার্ড কেড়ে নেওয়া হবে ইত্যাদি। ময়ুরেশ্বরের ঢেকা

গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল ভোটের আগেই হুমকি দিয়ে রেখেছিলো, তৃণমূল না জিতলে সাইকেল কেড়ে নেওয়া হবে, জরিমানা আদায় করা হবে। বাস্তবে বিধানসভা ভোটের পরে তা হাতে কলমে করে দেখিয়ে দিয়েছে।

এছাড়া বিস্তীর্ণ এলাকায় রেগায় কাজ বন্ধ করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমনিতেই রাজ্যে রেগায় কাজ খুবই কম হয়। যা হয় খাতায় কলমে। টাকা ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে যায়। তাও যেটুকু কাজ হচ্ছে, সেখানে গরিবের মধ্যে বিভেদ তৈরির রাস্তা নিয়েছে শাসক দল। যাঁরা তাদের ভোট দেয়নি বলে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের মনে হয়েছে, তাঁদের একশো দিনের প্রকল্পে কাজ দেওয়া হচ্ছে না। কাজ চাইতে তাঁরা গেলে, শুনতে হচ্ছে –"ভোট দিসনি, কাজও পাবি না।" নষ্ট করা হয়েছে ছোট দোকান, ফসলে আগুন দেওয়া হচ্ছে, পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে জীবিকা। একাধিক গ্রাম থেকে গরু, ছাগল, যাবতীয় আসবাব, ধান, চাল, টাকা-পয়সা লুট করে লরিতে তুলে চালান করছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। আমতার মুক্তিরচকের ধর্ষিতার পরিবারের উপর হামলা চালিয়েছে। বাগনান থানার শীতলপুর গ্রামে এক আশাকর্মীর শ্লীলতাহানি করেছে তৃণমূলীরা। তাঁর 'অপরাধ' ছিল বুথে সি পি আই (এম)-র এজেন্ট হয়ে বসেছিলেন। শাসক দলের খাস তালুক নন্দীগ্রামেও সব বুথে তারা জিততে পারেনি মারাত্মক একাধিপত্য কায়েম রাখা সত্বেও। তাই ফ্যাসিস্তসুলভ কায়দায় যে যে বুথে বা ওয়ার্ডে কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েতে বামপন্থীরা নির্বাচনে ভালো ফল করেছে, সেখানেই এই আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। সেইসব এলাকায় যাঁরা পোলিং এজেন্ট ছিলেন অথবা সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন, এমন কর্মীদের ওপর বেছে বেছে আক্রমণ করা হয়েছে। পরিকল্পিত এই আক্রমণের উদ্দেশ্য একটিই। তা হলো বামফ্রন্ট কর্মীদের বা বিরোধীদের নিচুতলার কর্মীদের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা, যাতে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন বা লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁরা মাথা তুলতে না পারে। অর্থাৎ আগামী নির্বাচনগুলিতে জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ, আত্মবিশ্বাসহীনতা মাথাচাড়া দিয়েছে শাসক দলের মধ্যে। আগামীদিনে বিরোধীদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ, অবকাশ আছে, মানুষ ক্ষুব্ধ – তা তারা বুঝতে পারছে। তাই এই লড়াইয়ের প্রধান শক্তি বামপন্থীদের এবং সাধারণভাবে বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করাই তৃণমূলী সন্ত্রাসের লক্ষ্য।

মানুষের অধিকার খর্ব

আদিবাসী প্রধান বেলপাহাড়ি হোক, অথবা তফসিলী জাতি প্রধান মেখলিগঞ্জ কিংবা গাইঘাটা। হতে পারে মুর্শিদাবাদের এমন কোন ব্লক যেখানে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত সংখ্যালঘু মানুষ সংখ্যালঘিষ্ট। কিন্তু মমতা ব্যানার্জির সরকার এ' সব বৈশিষ্ট্যকে আদৌ পাত্তা দিচ্ছে না। তাই দীর্ঘ কুড়ি বছর পর গত ২৫শে সেপ্টেম্বর সংবিধান-স্বীকৃত

জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের গণতন্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এই সংক্রান্ত বিল সংখ্যার জোরে, মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে বিধানসভায় পাশ করিয়েছেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী। বামপন্থীদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও গৃহীত হয়েছে এই সংক্রান্ত পঞ্চায়েত (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল ২০১২। প্রতিবাদে বামফ্রন্টের বিধায়করা ওয়াক আউট করেন। বিলটির মাধ্যমে জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এবার পঞ্চায়েত ভোটে রাখছেন না মমতা ব্যানার্জি। তফসিলী জাতি, আদিবাসী এবং অনগ্রসর অংশের মানুষের আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্বর কোন সুযোগ মনেই। পঞ্চায়েতের আসন সংরক্ষণের সীমা বেঁধে দেওয়া হলো ৫০ শতাংশে। এলাকায় মানুষের বসবাসের যাই হার হোক, তার কোন ছবি আসন সংরক্ষণে থাকবে না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন তফসিলী জাতি, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সহ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত হলেন মহিলারাও। কারণ তাঁদের জন্য পঞ্চায়েতে ৫০ ভাগ আসন সংরক্ষিত।

প্রসঙ্গত, বামফ্রন্টের সময়কালেই অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (ও বি সি)-দের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েতে ৫০ ভাগ আসন সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ও বি সি সংরক্ষণ চালু হলেই শুধু পিছিয়ে সংখ্যালঘুরা পঞ্চায়েত পরিচালনার সুযোগ পাবেন, এমন অবশ্য নয়।

প্রসঙ্গত, বামফ্রন্টের সময়কালেই অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (ও বি সি)-দের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েতে ৫০ ভাগ আসন সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ও বি সি সংরক্ষণ চালু হলেই শুধু পিছিয়ে সংখ্যালঘুরা পঞ্চায়েত পরিচালনার সুযোগ পাবেন, এমন অবশ্য নয়।

'পরিবর্তিত পঞ্চায়েত' লুঠের পঞ্চায়েত

রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির সিংহভাগ দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এটি এখন কোনও অভিযোগ নয় শুধু। রাজ্যবাসীর অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। যা অত্যন্ত যন্ত্রণার এবং লজ্জার। প্রায় প্রতিটি সরকারী প্রকল্পের সুযোগ পেতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের 'কমিশন', 'তোলা' দিতে হয় গ্রামবাসীদের।

চুরি বন্ধ করতে গেলে কী করতে হবে? মুখ্যমন্ত্রীর মতে ''চুরি আটকাতে হবে। তাই তাদের মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে।'' এই মানোন্নয়ন মানে কী? মমতা ব্যানার্জির মতে ''ভাতা বাড়ানো।'' ২০১৭-র ৩রা ফেব্রুয়ারি, নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পঞ্চায়েত রাজ সম্মেলনের উদ্বোধন করে তিনি এই মত বাতলেছেন। সেই মঞ্চে মমতা ব্যানার্জি পঞ্চায়েতের সদস্যরা যারা চুরি করেন, কেন করেন – তার ব্যাখ্যা দেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মুখ থেকে সেদিন শোনা যায়,''শুধু বলবে ও' চোর ও' চোর। আরে চুরি করবে না কী করবে? ওদের সুযোগ তো দাও।''

মুখ্যমন্ত্রীর সেদিনের প্রতিক্রিয়া শুনে অনেক পঞ্চায়েত সদস্যেরই মনে হয়, চোর-সাধুর কোনও তফাৎই নেই। পঞ্চায়েতের সদস্য মানেই চোর? মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় সি পি আই(এম)-র রাজ্য কমিটির সম্পাদক সূর্য মিশ্র বলেছিলেন,''যারা আমরা সবাই চোর বলে মিছিল করে, তাদের থেকে এর চেয়ে বেশি কী আশা করা যায়? আমরা সবাই চোর-চুরির সামাজিকীকরণ চাই – এটাই ওদের দাবি।''

কিন্তু আরও একটি প্রশ্ন হাজির হয় পঞ্চায়েতে দুর্নীতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যখ্যার পর। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে আসার পর মন্ত্রী, বিধায়কদের ভাতা অনেক বেড়েছে। তারপরও সেই মন্ত্রী, বিধায়কদের বিরুদ্ধে নানা আর্থিক কেলেঙ্কারীতে যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে কী করে? লোকসভার মোটা বেতন পাওয়া সত্ত্বেও অনেক সাংসদের বিরুদ্ধে চুরি, চিটফান্ডের টাকা লুটের অভিযোগ কেন উঠেছে? সারদা, নারদের মত ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে টাকা লুটের অভিযোগ উঠছে কেন?

অর্থাৎ পঞ্চায়েত সদস্য মাত্রই চোর নন। আবার ভাতা বাড়ালেই চুরি কমে যাবে, এটিও ভুল দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। আসল কথা – পঞ্চায়েতকে কোন্ দল কিংবা পার্টি কী চোখে দেখে? তাদের আদর্শ, নীতি কী? তাদের দর্শন কী?

তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও দর্শন এবং নীতি নেই। প্রধানত ধান্দা-নির্ভর এই দলটি। ফলে সমাজের সবকটি ক্ষেত্রের মত পঞ্চায়েতও তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে মূলত ধান্দা, টাকা কামানোর ক্ষেত্র।

একশো দিনের কাজের প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মত প্রকল্পগুলিতে দেদার চুরির নির্দশন ছড়িয়ে রাজ্যে। দুর্নীতি রাজ্য জুড়ে এবং ব্যাপক, পঞ্চায়েতের প্রতিটি পর্যায়ে। বার্দ্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধীদের ভাতা, আদিবাসী কিংবা তফসিলী জাতির মানুষের জন্য ভাতাসহ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে দীর্ঘদিন ধরে চালু পরিষেবা গ্রামবাসীদের প্রাপ্য। সেই ন্যায্য পাওনা 'পাইয়ে দেওয়ার' নাম করে কাটমানি নেয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা, এমন উদাহরণ ভুরিভুরি।

পঞ্চায়েতের কাজের আগেই দশ থেকে পনেরো শতাংশ অর্থ শাসকদলের নেতার পকেটে পৌঁছে দিতে বাধ্য হচ্ছেন ঠিকাদাররা। গরিবের বাড়ি নির্মাণের প্রকল্প পি এম এ ওয়াই জি-র ক্ষেত্রে দুর্নীতির ছবি আরও পরিষ্কার। অভিযোগ, পাকা বাড়ির রঙ পাল্টিয়ে টাকা আত্মসাৎ করছেন তৃণমূলের নেতারা। গরিব মানুষের মাথায় আর জুটছে না পাকা ছাদ। প্রায় প্রতি পঞ্চায়েতেই এই প্রকল্পের জন্য গরিব মানুষকে দিতে হচ্ছে দশ থেকে কুড়ি হাজার টাকা। তাও আবার অগ্রিম, আবেদন মঞ্জুর হওয়ার আগেই।

'আপ্লুত' কেন্দ্রীয় দল কাজ খুঁজে পাননি

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে ২০১৬-তে একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল নয়াদিল্লি থেকে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের

প্রতিনিধি সেই দলটি। ৩০শে মে থেকে ২রা জুন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের ওই প্রতিনিধি দল বর্ধমান, নদীয়া এবং বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে গ্রামবাসী, এসডিও, বিডিও-দের সঙ্গে কথা বলেছে। গ্রামোন্নয়ন এবং নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গেও কথা বলে গেছেন এই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। ওই প্রতিনিধি দলের অভিজ্ঞতা জানিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব অপরাজিতা সারেঙ্গি রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যসচিব বাসুদেব ব্যানার্জিকে একটি চিঠি দেন। সেই চিঠিতে তিনি জানান, সরকারের আতিথেয়তা, সংবর্ধনায় তাঁরা আপ্লুত। অভিভূত। তাঁদের 'মন আনন্দে উদ্বেল হয়েছে যখন বুঝেছেন দুর্দান্ত রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক উদ্যম' রাজ্যে উনন্নয়নমূলক কাজের পিছনে সক্রিয় আছে।

কিন্তু গ্রাম ঘুরে তারা কী জেনেছেন?

'বাস্তবের মাটিতে' তাঁরা একশো দিনের প্রকল্পে কোনও অনগোয়িং (চালু) কাজই দেখতে পাননি! চিঠিতে প্রতিনিধি দলের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লেখা হয়েছে –''এটি বিস্ময়কর, কারণ, অনেক কাজ দেখানো হয়েছে স্যানশাংনড হিসাবে। পঞ্চায়েত এবং ব্লক পর্যায়ে অনেক কাজ শুরু হয়ে গেছে বলেও দেখানো হয়েছে। যদিও আমরা আর্থিক বছরের দ্বিতীয় মাসেই হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু আমরা কোনও অনগোয়িং কাজ বাস্তবের মাটিতে দেখতে পাইনি।''

অর্থাৎ গ্রামের গরিব মানুষ কাজ পাচ্ছেন না। খাতায় কলমে দেখানো হয়েছে কাজ চলছে। ওই প্রতিনিধি দল দেখেছেন যে, কত কাজের দাবি আছে এবং কত কাজের মাস্টার রোল তৈরি হয়েছে তার কোনও হিসাবই সঠিকভাবে রাখা হয় না। অর্থাৎ মাস্টার রোলেই গোঁজামিল।

যদিও বি জে পি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এই চিঠি লিখেই দায়িত্ব শেষ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে 'বিব্রত' করা তাদের নীতিই নয়।

চুরি কখনও কখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বি ডি ও-রা পর্যন্ত চুপ করে থাকতে পারেননি। ২০১৫-র জুলাইয়ে এম ঘটনার সাক্ষী হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় ব্লক। ওই ব্লকের তৎকালীন বি ডি ও ছিলেন লীনা মণ্ডল। তিনি জেলার সভাধিপতি, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী উত্তরা সিংকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, 'কিছু উপভোক্তা সোস্যাল অডিটরদের কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ করেছেন যে তাঁরা ইন্দিরা আবাস যোজনায় বরাদ্দ টাকার কিছু অংশ হাতে পাচ্ছেন। তাই তাঁদের পক্ষে বাড়ি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না।' ইন্দিরা আবাস যোজনায় উপভোক্তাদের প্রাপ্য টাকা দলের নেতারা 'জোরজবরদস্তি' নিয়ে নিচ্ছেন বলে এস ডি ও-র কাছে সম্প্রতি লিখিতভাবে অভিযোগ করেছিলেন হুগলীর খানাকুল-১নং ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত এক পঞ্চায়েতের উপপ্রধানও।

এই 'কিছু অংশ' টাকা যাচ্ছে কোথায়? এই টাকা তোলা বাবদ নিয়ে নিচ্ছেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা।

একশো দিনের প্রকল্পঃ টাকা যাচ্ছে কোথায়?

আমলাশোলে ২০১৪-তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছিলেন যে, একশো দিনের প্রকল্পে ১৫০ দিন করে কাজ দেবেন। সম্প্রতি তিনিই দাবি করেছেন, ২০০ দিন করে কাজ দেবেন।

চলতি আর্থিক বছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে ৪৩ দিন গড়ে কাজ হয়েছে। ২০১৬-১৭-তে তা ছিল ৪০ দিন। ২০১৫-১৬-তে তা ছিল ৪৬ দিন। ২০১৪-১৫-তে ছিল ৩৩ দিন। ২০১৩-১৪-তে ছিল ৩৭ দিন। অর্থাৎ গত পাঁচ বছরে কখনও রেগার গড় কাজের দিন ৫০ ছাড়ায়নি। রাজ্যে গড়ে দেড়শো, দুশো দিন কাজ নেহাতই উর্বর-মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পনাই থেকে গেছে।

রেগায় আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে কাজের ক্ষেত্রে। আর্থিক বছরের গোড়ায়কতগুলি কাজ হবে, কী কী কাজ হবে তা জানিয়ে দিতে হয় রাজ্যগুলিকে। বছরের শেষে খতিয়ে দেখা হয় সেই গৃহীত প্রকল্পগুলির কত অংশ শেষ হলো। কত অংশ চলছে ইত্যাদি। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের আমলে দেখা যাচ্ছে, প্রতিবছরই টাকা শেষ হচ্ছে। দেদার খরচ দেখানো হচ্ছে। কিন্তু বছরের গোড়ায় ঘোষিত কাজগুলির অধিকাংশ শেষ হচ্ছে না। যেমন ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে রেগা প্রকল্পে ৬,৭৯, ৭৭৩টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। বছর শেষে জানা গেল, শেষ হয়েছে ১,৪২,৯৯৩টি-র কাজ। অর্থাৎ কাজ শেষের হার ২১.০৪%। টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। এটি কখন হতে পারে? যখন কাজের টাকা তছরূপ হচ্ছে। ভুয়ো মাস্টার রোল দেখানো হচ্ছে। একই জায়গায় বারবার কাজ দেখানো হচ্ছে। সম্প্রতি অত্যাধুনিক প্রক্রিয়ায় কাজের এলাকা খতিয়ে দেখার স্যাটেলাইট পদ্ধতি চালু হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে। কিন্তু তা পুরোপুরি এখনও সক্রিয় হয়নি।

একশো দিনের প্রকল্প : বাদ গরিবই

গরিব মানুষ কতটা অবহেলিত এই শাসন কালে? রেগা প্রকল্পেই তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাজ্যের ইচ্ছুক ভূমিহীন খেতমজুরদের মাত্র ২ শতাংশকে জবকার্ড দিয়েছে মমতা ব্যানার্জির সরকার। অথচ পাওয়ার কথা প্রত্যেকের। তাঁদের কাজের দরকার। তাঁরা ভূমিহীন খেতমজুর। এমনকি নিজেদের কায়িক শ্রম ছাড়া তাঁদের কোনও সম্পদও নেই।

'ইচ্ছুক' বলা হচ্ছে কেন ? ২০১১-র কাস্ট সেনসাস অনুসারে রাজ্যের প্রায় ৭১ লক্ষ পরিবার শ্রমনির্ভর ভূমিহীন খেতমজুর। তাঁদের মধ্যে সমীক্ষা চলছে গত প্রায় চার বছর ধরে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪০ লক্ষ ১৫ হাজার পরিবারের সমীক্ষা হয়েছে।

তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে, তাঁরা একশো দিনের প্রকল্পে কাজ করতে চায় কিনা। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ৩ লক্ষ ২০ হাজারের কিছু বেশি পরিবার একশো দিনের প্রকল্পে কাজ করতে চায় বলে জানিয়েছে। তাঁদেরকেই 'উইলিং' বা 'ইচ্ছুক' বলা হচ্ছে সরকারী খাতায়।'' এই 'ইচ্ছুক'-দের মধ্যে কতজন রেগার জবকার্ড পেয়েছে? রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে রাজ্য সরকার জবকার্ড দিতে পেরেছে ৭,৩১৭টি পরিবারকে।

এই সংখ্যাটি 'ইচ্ছুক' পরিবারগুলির ২.২ শতাংশ।

গ্রামের গরিব মানুষদের এই বিরাট অংশ ইচ্ছা থাকলেও জব কার্ড পাননি। এটি নিঃসন্দেহে একটি আশঙ্কাজনক দিক। ইতিমধ্যেই অনেক জবকার্ড বাতিলও হয়ে যাচ্ছে রাজ্যে। ফলে একশো দিনের প্রকল্পে কাজের সুযোগ হারানো মানুষের সংখ্যা গ্রামে বাড়ছে। আরও একটি বিষয় রয়েছে। সমীক্ষা যাঁদের নিয়ে করা হয়েছে, তাঁদের বিরাট অংশ রেগার কাজ করতে, তার জব কার্ড পেতে আগ্রহ দেখাননি। তাঁদের 'আনউইলিং' বা 'অনিচ্ছুক' বলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার চিহ্নিত করেছে। এখনও সমীক্ষা হওয়া ৪০,১৫, ৪১১টি পরিবারের মধ্যে বিরানব্বই ভাগ পরিবার রেগার কাজ করতেই চাননি।

ভুয়ো জব কার্ড : টাকা পেলো কে?

কেন্দ্রীয় সরকার জবকার্ড ছাঁটাই করতে বলেছে। রাজ্য সরকার তাতে রাজিও হয়েছে। অজুহাত অনেক ভুয়োকার্ড নাকি রাজ্যে আছে। ২০১৭-র ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ১৩ লক্ষের বেশি ভুয়ো জবকার্ড বাদ গেছে রাজ্যে। দেশে সবচেয়ে বেশি। দেশে জব কার্ড ছাঁটাই হয়েছে প্রায় ৪৭ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ একা ১৩ লক্ষ ১৮ হাজার। আসলে রাজ্যের গড় কাজের দিন বাড়িয়ে দেখাতে জব কার্ড ছাঁটাই করছে রাজ্য সরকার। আর একটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে – এত ভুয়ো জবকার্ডে কাজ দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা কাদের পকেটে গেছে? গত ছ' বছরে এই ভুয়ো কার্ডগুলিকে ব্যবহার করে কয়েক হাজার কোটি টাকা শাসক দলের নেতারা কামিয়েছেন।

জমি হয়েছে ধান্দার কারাবার

রাজ্যের ভূমি মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তাঁর সেই দপ্তর সম্প্রতি একটি আভ্যন্তরীণ নির্দেশিকা (নং-২৫৫৫) জারি করে জানিয়েছে, রাজ্যের অনেক জমির মালিকের নাম পাল্টে গেছে। প্রকৃত মালিকের নাম মুছে অন্যজনের নাম বসানো হয়েছে। পাশপাশি পাল্টে দেওয়া হয়েছে জমির চরিত্র। নির্দেশটিতে রাজ্যের যুগ্ম ল্যান্ড রিফর্মস কমিশনার শেখর দত্ত সই করেছেন চলতি বছরের ৮ই আগস্ট।

রাজ্যের ল্যান্ড রেকর্ড অ্যান্ড সার্ভেস এবং জয়েন্ট ল্যান্ড রিফর্মস কমিশনারের অফিসের পর্যবেক্ষণ হলো –''এও দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে এই অফিসাররা জমির

রেকর্ডস অফ রাইট(আর ও আর)-র পবিত্রতা মারাত্মকভাবে নষ্ট করে জমির অধিকারীর নাম মুছে দিয়েছেন অথবা জমির চরিত্র বদলে দিয়েছেন...।'' এবং ''এই প্রবণতা সব নিয়মকানুনকে বাতাসে উড়িয়ে আশঙ্কাজনক পরিমাণে পৌঁছেছে।''

অর্থাৎ রাজ্যের প্রচুর জমির প্রকৃত অধিকারীর নাম পাল্টে দেওয়া হয়েছে, জমির চরিত্র বদলে দেওয়া হয়েছে। আর এই সবই হয়েছে গত কয়েকবছরে জমির নথী কম্পিউটার বন্দী করার সময়। অনেক বর্গাদারের চাষের অধিকারও এই পদ্ধতিতে কেড়ে নেওয়া হয়েছে – জানাচ্ছে ওই নির্দেশই। জমির পরিমাণ কত? সরকার জানানোর ভরসা পাচ্ছে না। কারণ, প্রচুর অভিযোগ, ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে এই নিয়ে। সরকার এখন দাবি করছে ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের অনেক আধিকারিকরাই দায়ী। কিন্তু শুধু অফিসারদের কাণ্ড এটি হতে পারে না। এত বড় একটি দুর্নীতি, এত মানুষকে জমির অধিকার থেকে ছিটকে দেওয়ার কাজে অফিসারদের মদত দেওয়া, তার থেকে কমিশন নেওয়ার কাজটি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারাই করেছেন বলে অভিযোগ।

গ্রামবাংলায় এখন এমন জমিচুরির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এমন শক্তি একটিই – তা তৃণমূল কংগ্রেস। এছাড়াও বহু পাট্টাদার, বর্গাদারকে উচ্ছেদ করে গরিবের জমি দখল করেছে শাসক দলের কর্মীরা। তারও পরিমাণ কয়েক হাজার একর।

ভাঙড়-ভাবাদিঘী-বোলপুর

জমি হাঙরদের হয়ে তৃণমূলের বাহিনী বন্দুকের নল ঠেকিয়ে কলকাতা সংলগ্ন ভাঙড়ের জমি দখলের কাজ চালাচ্ছিলোই। পাওয়ার গ্রিডের নামে সেই জমি দখলের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়িয়েছেন ভাঙড়ের মানুষ। ২০১৭ সালের ১৭ই জানুয়ারি সেই প্রতিবাদী মানুষদের ওপরেই গুলি চালিয়েছে মমতা ব্যানার্জির পুলিশ। গুলিতে মৃত্যু হয়েছে মফিজুল শেখ আর আলমগীর মোল্লার, একজনের বয়স ২২, একজনের বয়স ২৪। আহত হয়েছেন আরও এক যুবক। সারা রাজ্য ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের অফিসের সামনে প্রতিবাদ সভায় দাঁড়িয়ে শহীদ মফিজুলের পিতা বলে গিয়েছেন, 'খুনী সরকারের কাছ থেকে টাকা চাই না। ন্যায় বিচার চাই। শাস্তি দিতে হবে পুলিশ আর আরাবুল ইসলামকে।' জমির লোভ তাও কাটেনি তৃণমূল সরকারের। বছরভর হামলা চলেছে। তবু আত্মসমর্পন করেনি ভাঙড়। পুলিশ আর তৃণমূলের বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম চলছেই।

রেললাইন পাতার নামে ৫৪ বিঘা দীঘি বুজিয়ে দখলের পরিকল্পনা করেছিলেন তৃণমূলের নেতারা। অন্য জমি থাকতে দীঘি বোজানো কেন? ২০১৭ সালের মার্চ মাসে তৃণমূলের মদতপুষ্ট ঠিকাদাররা দীঘি বোজানোর চেষ্টা করতেই প্রতিবাদে সরব হলেন হুগলী জেলার গোঘাটের ভাবাদিঘি মৌজার বাসিন্দারা। সেচের জল থেকে মাছ চাষ,

গরিব মানুষদের জীবনজীবিকার একমাত্র উপায় কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা মানবেন কেন তাঁরা। শুরু হলো অত্যাচার। পুলিশ দিয়ে মিথ্যা অভিযোগে একের পর এক গ্রেপ্তার। সেভ ডেমোক্রেসির প্রতিনিধিদের নিয়ে আন্দোলনকারীদের আইনী পরামর্শ দিতে যাচ্ছিলেন আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। পথে পুলিশের চোখের সামনে তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে রাজ্য সড়কের ওপরে ফেলে মারধর করলো তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনী।

'হয় শিল্প করো, নয় জমি ফেরৎ দাও'। ২০১৭ সালে মমতা ব্যানার্জির প্রতারণার জবাব এভাবেই দিয়েছেন বোলপুরের শিবপুরের বাসিন্দারা। জমি নেওয়া হয়েছিলো শিল্প তৈরির জন্য, কাজের আশায় অপেক্ষায় ছিলেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু কোথায় শিল্প, কোথায় কাজ? মুখ্যমন্ত্রী সেখানে রিয়েল এস্টেটের কারবারের বন্দোবস্ত করেছেন। জানুয়ারি মাসেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় বোলপুরে যা সারা বছর ধরে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। তৃণমূলের 'মাথায় কম অক্সিজেন যাওয়া' নেতা অনুব্রত মন্ডলও এই বিক্ষোভ থামাতে পারছেন না। পুলিশের সামনেই তিনি আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে হুমকি দিয়েছেন, 'বাধা দিতে এলে হাত পা ভেঙে রেখে দেবো।' কিন্তু প্রতিবাদ যখন প্রতিরোধের মাত্রা পেয়েছে, হুমকিতে তখন ডরাচ্ছে কে?

দেদার বেড়েছে জমির মিউটেশন ফী

কোথাও ৪০ গুণ। কোথাও ১০০ গুণ। কোথাও তারও বেশি – ২০০ গুণ। নিঃশব্দে গ্রাম, শহরের মিউটেশন ফী দেদার বাড়িয়ে দিয়েছে মমতা ব্যানার্জির সরকার।

রাজ্যের ভূমি মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজেই। ফলে এই সিদ্ধান্ত একান্তই তাঁর। ২০০৫-এ, শেষবার মিউটেশন ফী বেড়েছিল রাজ্যে। তাও বেড়েছিল নামমাত্র। বামফ্রন্ট সরকার গ্রাম, শহরের সাধারণ মানুষের উপর বিপুল মিউটেশন ফী চাপানোর বিরোধী ছিল।

এবার কেমন বদল ঘটেছে? ২০০৫-এর নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে এক ডেসিমেল কৃষি জমির মিউটেশন করাতে খরচ হত ১ টাকা। অর্থাৎ এক একরের মিউটেশন ফী ছিল ১০০ টাকা। এখন গ্রামাঞ্চলে এক একর কৃষি জমির মিউটেশন ফী দাঁড়িয়েছে ৪০০০ টাকা। বেড়েছে ৪০ গুণ।

গ্রামাঞ্চলে এমন জমি আছে, যা চাষের কাজে ব্যবহার হয় না। আবার তা কোনও বাণিজ্যিক কাজেও ব্যবহৃত হয় না। এই 'নন-এগ্রিকালচারাল, নন-কমার্শিয়াল' জমির মিউটেশন ফী ২০০৫-এ ছিল ডেসিমেল পিছু ১০ টাকা। অর্থাৎ একর পিছু ১০০০ টাকা। তাকে মমতা ব্যানার্জির সরকার পৌঁছে দিয়েছে ১০,০০০ টাকায়। বেড়েছে দশগুণ।

গ্রামাঞ্চলের জমি কিছু ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে কিংবা শিল্পের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর প্রবণতা বেড়েছিল রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় বাড়তি গতি আনার পর। ২০০৫-এ এমন সব জমিকে বামফ্রন্ট একটি ভাগেই রেখেছিল। সেক্ষেত্রে মিউটেশন

ফী ছিল ডেসিমেল পিছু ২০ টাকা। অর্থাৎ একর পিছু ২০০০ টাকা। মমতা ব্যানার্জি এই ক্ষেত্রে দুটি ভাগ করেছেন। তাঁর সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশ অনুসারে, ১০ ডেসিমেল জমি পর্যন্ত একরকম হার। আর তার বেশি হলে আর একরকম। ১০ ডেসিমেল পর্যন্ত বাণিজ্যিক এবং শিল্পের কাজে ব্যবহৃত গ্রামাঞ্চলের জমিতে মিউটেশন ফী ডেসিমেল পিছু ৫০০ টাকা হয়েছে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে দশ ডেসিমেল জমির মিউটেশন ফী আগে ছিল ২০০ টাকা। এখন তা দাঁড়ালো ৫০০ টাকা।

আর যদি বাণিজ্যিক এবং শিল্পের কারণে ব্যবহৃত জমি দশ ডেসিমেলের বেশি হয়? বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে তার মিউটেশন ফী ছিল একই – ডেসিমেল পিছু ২০ টাকা। অর্থাৎ এক একরে মিউটেশন ফী হত সেই ২০০০ টাকাই। এখন তা বেড়ে একরে দাঁড়াবে ডেসিমেল পিছু ১০০০ টাকা। অর্থাৎ এক একরে তা দাঁড়াবে ১লক্ষ টাকা। যত জমি বাড়বে, তত টাকা বাড়বে।

উল্লেখ্য, গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দু-পাঁচ একর জমি নিয়ে গড়ে ওঠে ছোট কিংবা মাঝারি শিল্প। অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলির উদ্যোগপতিরা হন স্থানীয় যুবক যুবতীরা। বোঝাই যাচ্ছে, মমতা ব্যানার্জির সরকার মূলত ছোট শিল্পের উদ্যোগপতিদের থেকে মিউটেশন ফী বাবদ দেদার টাকা তুলতে চাইছেন।

থমকে গেছে ভূমি বন্টন

বামফ্রন্ট সরকার নেই। কিন্তু শুধু কৃষকের জমির অধিকারের প্রশ্নেই দুই সরকারের নীতি, পথের ফারাক স্পষ্ট হয়ে গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর সরকার কৃষকের থেকে জমি কিনে উন্নয়ন করবে। এখন সেই সরকারের ভূমিসংস্কার দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গত ছ' বছরে সরকার জমি কিনেছে মাত্র ৯৫০ একর! সিঙ্গুরের শিল্পের জন্য অধিগৃহীত এলাকার থেকেও কম।

পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ থেকেই কৃষি জমির পাট্টা দেওয়ার গতি কমছিল। একটি বড় কারণ, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ২০১১-র ১৮ই অক্টোবর তাদের নির্দেশিকায় (মেমো নং-আই আর সি/৬২৪/১১) জানিয়ে দেয় – 'ভূমিহীনদের মধ্যে মূলত কৃষিজমি বন্টনের যে ধারায় আগের ভূমি সংস্কার চলেছে, তা থেকে সরে আসতে হবে এবার।' সরকারের জমি নীতির সুপারিশকারী কমিটি বলেছিল,'জমির অবৈধ দখলদারিকে কখনও ভূমি সংস্কার বলা যায় না। বরং এটিকে জমি ডাকাতি বলা যায়। সরকার যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে এই জমি ডাকাতি বন্ধ করতে।'

ফল হাতেনাতে। রাজ্যের ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০১১ থেকে ২০১৬-র মার্চ – এই পাঁচ বছরে রাজ্যে ৩ লক্ষ ৫ হাজার পাট্টা দেওয়া হয়েছে রাজ্যে।

তার মধ্যে ৫ ডেসিমেল করে থাকার জমি বাবদ দেওয়া হয়েছিল ২ লক্ষ ১ হাজার ৭০টি। তা চাষের জন্য নয়। অর্থাৎ চাষের জন্য পাঁচ বছরে দেওয়া হয়েছিল ১ লক্ষ ৩ হাজার ৯৩০টি মত জমি। ২০১৭-র মার্চে এসেও সংখ্যাটি সেই ৩ লক্ষ ৫ হাজারেই দাঁড়িয়ে আছে। একবছর একটি পাট্টাও কৃষি জমির দেওয়া হয়নি। এমনকি থাকার জমি, অর্থাৎ 'নিজ ভূমি নিজ গৃহ'-ও বাড়েনি। সরকারই তা জানাচ্ছে।

ঋণের জালে কৃষক : রিপোর্ট নাবার্ডের

কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছেন না। ধান, আলু, পাট থেকে পান কিংবা সরষে, ডালশস্য – রাজ্যের প্রতিটি ফসলের ক্ষেত্রে একই অবস্থা। লাগাতার লোকসানের উপর রয়েছে মহাজনের ঋণ। লোকসান এবং ঋণের চাপে গত ছ' বছরে অনেক কৃষিজীবি আত্মঘাতী হয়েছেন। অথচ তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করছে রাজ্যে কৃষকের আয় নাকি বাড়ছে!

কেমন বাড়ছে, তা জানা যায় নাবার্ডের রিপোর্টেই।

রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে রিপোর্ট দিয়েছে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট(নাবার্ড)। পাঁচ পাতার ওই রিপোর্টটির শিরোনাম 'ফোকাস পেপার, ২০১৬-১৭'। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি এবং কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে আশঙ্কাজনক তথ্য ও পর্যালোচনা রয়েছে।

ওই ফোকাস পেপারে জানানো হয়েছে, রাজ্য কৃষিজীবী পরিবারগুলি প্রতি মাসে গড়ে ১৯০৮ টাকার ঋণ জালে জড়াচ্ছে। কৃষিজীবীদের আয় আর ব্যয়ের এই ব্যবধান কমাতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি সঙ্কট আরও প্রবল হবে। এখনই কৃষি সমবায়গুলিকে গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং পেশাদারিত্ব না চালু করতে পারলে অবস্থা আরও সঙ্গীন হবে।

নাবার্ডের হিসাবে রাজ্যের ৯৪ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবারের মাসে গড় আয় ৩৯৮০ টাকা। আর তাদের মাসে গড় খরচ ৫৮৮৮ টাকা। ফারাক মাসে ১৯০৮ টাকা।

ফসলের ক্ষতি হলেও বীমার সুবিধা নেই

কখনো বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি, কখনো অনাবৃষ্টিতে, কখনো পোকার আক্রমণে। কিন্তু বাংলার কৃষকদের সামনে এখন বীমার ক্ষতিপূরণের সুযোগ নেই। শস্যবিমার বিধি ব্যবস্থাকে লাটে তুলে দিয়ে কৃষকদের 'বিধাতা'র হাতে তুলে দিয়েছে তৃণমূল সরকার। জেলায় জেলায় ম্যাটাডোরে ট্যাবলো সাজিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখের ছবি লাগিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচারগাড়ি ছুটে বেড়াচ্ছে। তাতে নানা উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা'র কথাও বলা আছে। প্রচার গাড়ি থেকে বলা হচ্ছে, শুধু জমির মালিক নয়, ভাগচাষি, খেতমজুর সবাই এই বিমার সুযোগ নিতে পারবে। বিমার প্রিমিয়ামের একাংশ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার, একাংশ দেবে রাজ্য সরকার। কিন্তু কৃষকদের কাছে তা অধরাই

থেকে গেছে। একদিকে রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করিয়ে বিমার প্রিমিয়াম দেওয়ার কাজটাই করেনি। অন্যদিকে মোদী সরকার শস্যবীমার নামে আর্থিক কেলেঙ্কারি করে বেসরকারী বীমা কোম্পানিগুলিকে সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতোই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বণ্টনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেড়াচ্ছেন তাও কাগজে কলমে। গরিব কৃষকরা কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ব্যাঙ্কঋণের সুযোগ থেকে বঞ্চিতই থেকে গেছেন। আসলে কৃষি অলাভজনক ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় জমির মালিকরা বেশিরভাগই কৃষি থেকে সরে অন্য পেশায় যুক্ত হচ্ছেন। বর্ষায় আমন চাষটা তাঁরা নিজেরা বা কৃষি শ্রমিক দিয়ে করালেও বোরো চাষটা চুক্তির ভিত্তিতেই করাচ্ছেন। গরিব খেতমজুররা অনেকেই লাভের আশায় ধার-দেনা করে বোরো চাষে নামছেন তাঁদের জমি নিয়ে। চুক্তি অনুসারে টাকা দিচ্ছেন বা বিঘা প্রতি চার পাঁচ বস্তা করে ধান দিচ্ছেন। ব্যস্, মালিকের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। চাষের সব খরচ করে বাকি লাভ চাষির। কিন্তু জমির কাগজপত্র কোন কিছুই না থাকায় এই চাষে ধার-দেনা করতে হচ্ছে মহাজন বা ব্যবসাদারদের থেকেই। ব্যাঙ্ক থেকে কিছু মেলে না। ফসল বিমাও হচ্ছে না। বিপর্যয় হলে সব শেষ। আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে ঋণগ্রস্ত কৃষক অথবা চুক্তিতে চাষ করা গরিব খেতমজুররা।

তৃণমূল সরকার এদের জন্য নতুন বিমা প্রকল্পকে কার্যকর না করলেও বামফ্রন্ট সরকার থাকার সময়ে কিন্তু ভাগচাষি ও খেতমজুরদের সুরক্ষার জন্য ঋণ এবং ওয়েদার বেস্‌ড ক্রপ ইনসিওরেন্সের একটি ব্যবস্থা করেছিলো। শুধু জমিমালিকরাই নয়, ভাগচাষি ও খেতমজুররা যাতে প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি বা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে পারেন তার জন্য জয়েন্ট লায়াবিলিটি গ্রুপ তৈরি করিয়ে কৃষিঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। পঞ্চায়েত প্রধানের লিখিত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে কেউ চাষ করেছে কিনা তা জেনে ঋণ মঞ্জুর করা হতো। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে কৃষকসভা, পঞ্চায়েত সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে শস্যবিমার সুবিধা আদায় করতো। কিন্তু এখন শুধু বেসরকারি ঋণগ্রহীতা কৃষকরাই নন, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ নেওয়া কৃষকরাও শস্যবিমার সুযোগ পাচ্ছেন না। কারণ রাজ্য সরকার বিমার প্রিমিয়াম দেয়নি। কালবৈশাখীতে ফসলের ক্ষতি এবং বন্যায় ফসলের ক্ষতি, কোনোক্ষেত্রেই মিলছে না বীমার ক্ষতিপূরণ। তাহলে কী মিলছে? কোথাও কোথাও সরকারী ক্ষতিপূরণ মিলছে বটে, তবে তা শাসকদলের মর্জি মাফিক। দুটো পাশাপাশি ব্লকে ঝড়ে ফসলের ক্ষতির পরেও একটি ব্লকের কৃষকরা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন, অপর ব্লকের কৃষকরা ক্ষতিপূরণ পাননি এমন ঘটনাও আকছার ঘটছে। যে ব্লকে বা যে গ্রাম পঞ্চায়েত শাসকদলের নয় সেখানকার কৃষকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এমনকি একই গ্রামের প্রতিবেশীদের মধ্যেও ক্ষতিপূরণ পাওয়া নিয়ে বৈষম্য হচ্ছে রাজনৈতিক রঙ দেখে। ২০১৭ সালের বন্যার পরে এমন অভিযোগ ব্যাপকহারে

দেখা গিয়েছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বেনিফিসিয়ারি বাছাই করা হচ্ছে না, তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে বেনিফিসিয়ারি বাছাই হচ্ছে। এমনকি যার ফসলের ক্ষতি হয়নি, যিনি চাষই করেননি তিনিও ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাচ্ছেন স্রেফ তৃণমূল নেতাদের সুপারিশের জোরে।

সহায়ক মূল্য নেই, অভাবী বিক্রি চলছে ধানের

সারা দেশেই কৃষকরা ফসলের সহায়ক মূল্য পাচ্ছেন না, আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন ঋণগ্রস্ত হয়ে। তৃণমূল সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদেরও যে একই অবস্থা বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং তথ্য দুটো দিক থেকেই তার প্রমাণ মিলছে। এরাজ্যের কৃষকরা ধান পাট আলু সব্জী কোনোকিছুরই দাম পাচ্ছেন না। একদিকে উৎপাদন খরচ বাড়ছে, অন্যদিকে ফসল বিক্রির সময় দাম পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ বাজারে সেই ফসলই বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেশের ১৬টি রাজ্যে ধানের অভাবী বিক্রি নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছিলো কেন্দ্রীয় সরকার। একটি সপ্তাহের পাঁচদিনের তথ্য বিশ্লেষণ করে সেই রিপোর্টেই দেখানো হয়েছে, ১৬টি রাজ্যের মধ্যে ধানের অভাবী বিক্রিতে শীর্ষে ছত্তিশগড়। দ্বিতীয় স্থানে তামিলনাড়ু। তারপরেই স্থান পশ্চিমবঙ্গের। ১৬টি রাজ্যের ধান বিক্রির পাইকারি বাজারে কত ধান এসেছে, সেই ধান কত দর দিয়ে বিক্রি হয়েছে, এই সব তথ্য বিশ্লেষণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিবেদনে তৈরি করে পাঠানো হয়েছে রাজ্যগুলিতে। আর তাতেই ফুটে উঠেছে এরাজ্যে ১৬টি পাইকারি বাজারে ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের থেকে কুইন্টাল পিছু ২০০ থেকে ৩৫০ টাকা কম দরে বিক্রি হয়েছে ধান।

কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর এই সময়কালে রাজ্যের বাঁকুড়া সদর, ডায়মন্ডহারবার, দিনহাটা, এগরা/কাঁথি, ফালাকাটা, গড়বেতা, ঘাটাল, হলদিবাড়ি, জিয়াগঞ্জ, কান্দি, খাতড়া, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ, ময়নাগুড়ি, তমলুক ও তুফানগঞ্জ মিলিয়ে ১৬টি পাইকারি বাজারে ধানের দাম ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের নিচে। রাজ্যের ৮টি জেলাজুড়ে ধানের এই অভাবী বিক্রির ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিবেদনে। ধানের অভাবী বিক্রির এই তথ্য স্বতপ্রণোদিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি করেনি। রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের তরফ থেকে দিল্লিতে পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতেই এই রিপোর্ট তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ মুখ্যমন্ত্রীসহ তৃণমূল সরকারের মন্ত্রীরা জোর গলায় দাবি করে চলেছেন, ১৫ লক্ষ ৩২ হাজার কৃষকের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দিয়ে ধান কিনেছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের এই দাবিকে মানতে নারাজ কৃষকরাই। তাঁদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত, কো অপারেটিভ, রাইসমিলকে ব্যবহার করে কৃষকের নাম ভাঁড়িয়ে যুক্ত করা

হয়েছে। সরকারের সাহস থাকলে ওই ১৫ লক্ষ কৃষকের নাম প্রকাশ করুক। সরকার ধান কিনছে ফড়েদের কাছ থেকে, সরকারী সাবসিডিও ঢুকছে তাদেরই পকেটে। কৃষকরা অনেক কম দামে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন ফড়েদের কাছে বা রাইসমিল মালিকদের কাছে। ঋণ শোধের জন্য কৃষকের ধান বিক্রি করে দ্রুত টাকার দরকার থাকে। সরকারী ব্যবস্থায় অ্যাকাউন্টে টাকা এত দেরি করে আসে কৃষকদের কাজে আসে না। আর ধান কেনার শিবিরগুলিতে যেভাবে ফড়ে ও রাইসমিলের গভীর সম্পর্ক থাকে তাতে কৃষকদের হয়রানি বাড়ে বই কমে না। তাই ধান তোলার পর সরকারের কাছে যাওয়ার আগে কৃষক অভাবী বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ধুঁকছে সমবায়

এই অবস্থা বদলাতে নাবার্ডের পক্ষ থেকে কিছু সুপারিশও করা হয়েছে রিপোর্টে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কৃষি সমবায়গুলিকে শক্তিশালী করা। সমবায়গুলির ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা এবং সেগুলিকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে সমবায়গুলির সদস্য বাড়ানো, বিশেষত যাঁরা ঋণ নেবেন তাঁদের বেশি করে সদস্য করার সুপারিশ করা হয়েছে। সমবায়গুলিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নাবার্ডের সুস্পষ্ট পরামর্শ হলো – সেগুলি পরিচালনায় গণতান্ত্রিক এবং পেশাদারী মনোভাব নিয়ে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে পরিচালনা করতে হবে।

যদিও রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক উল্টো করেছে। সমবায়গুলিতে দেদার দুর্নীতি। সমবায়গুলি ধ্বংসের মুখে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, কর্মীরা সমবায় নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কৃষকরা যেতে পারেন না সমবায়গুলিতে। তৃণমূল কংগ্রেসের দলতন্ত্র এবং দুর্নীতিতে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে গত কয়েক বছরে। অনেক সমবায়ে নির্বাচনই হয়নি। যেখানে হয়েছে সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিরোধীদের নির্বাচনে দাঁড়াতেই দেওয়া হয়নি। কৃষকদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই পরিবেশ যথেষ্ট প্রতিকূল হয়েছে – নাবার্ডের রিপোর্ট তাই জানাচ্ছে।

কৃষক বনাম ক্লাব

কৃষক ভরতুকি পাচ্ছেন ক্লাবের থেকে কম।

প্রতি বছর ক্লাবগুলিকে টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। আর গত পাঁচ বছর ধরে কেন্দ্রীয় প্রকল্প অনুসারে চাষের যন্ত্র কেনার জন্য বড়, মাঝারি, ছোট কৃষকদের ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে দেশের প্রতিটি রাজ্যকে। যে রাজ্য যত কৃষককে সাহায্য করতে চায়, তাদের জন্য সেই অনুসারে টাকা বরাদ্দ হয়। বড় কিংবা মাঝারি কৃষকদের ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলারের মত যন্ত্রের জন্য ভরতুকি দেওয়া হয়।

রাজ্যের কৃষি দপ্তরের হিসাব অনুসারে ২০১৬-১৭-তে রাজ্যে গরিব কৃষক, যাঁদের জমি খুবই অল্প, তাঁদের ১০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ভরতুকি দেওয়া হয়েছে। পেয়েছেন ৩২,৫১৩ জন কৃষক। উল্লেখ্য, যাঁদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আছে, এমন কৃষকই এই ভরতুকি পেতে পারেন। প্রসঙ্গত, ছোট কৃষকদের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ কমেছে। ২০১৪-১৫-তে প্রায় ৫৯ হাজার কৃষক এই ভরতুকি পেয়েছিলেন। ২০১৬-১৭-তে তা নেমে এসেছে ৩২,৫১৩-য়। ভরতুকির পরিমাণও অনেক কমেছে। ২০১৪-১৫-তে ভরতুকির পরিমাণ ছিল ২৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। এবার তা নেমে এসেছে ১০ কোটি ১৪ লক্ষে।

আর ক্লাব? ওই একই বছরে, অর্থাৎ ২০১৬-১৭-তে রাজ্যের ৭১৯৪টি ক্লাবকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে তথাকথিত 'মা-মাটি-মানুষের' সরকার। তার পরিমাণ প্রায় ৯০ কোটি টাকা। তার মধ্যে ২ লক্ষ টাকা করে পেয়েছে ২০০০ ক্লাব। আর ৫১৯৪টি ক্লাব পেয়েছে ১ লক্ষ টাকা করে। চলতি আর্থিক বছরে (২০১৭-১৮) ক্লাবগুলিকে ৭৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে – এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৫০০ ক্লাবকে ১ লক্ষ টাকা করে, ২০০০ ক্লাবকে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। সিদ্ধান্ত এমনই।

রেশন : এক রহস্য

রাজ্যে কতজন ২ টাকা কেজি চাল পান?

রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী বিধানসভায় ২০১৭-র ৩রা মার্চ জানিয়েছেন,' ৬ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৩৯ জন রাজ্যবাসী ২ টাকা কেজি চাল পাচ্ছেন।' এর মধ্যে রাজ্য সরকার কতজনকে দিচ্ছে? তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করে পুরোটাই তাদের মুখ্যমন্ত্রী দিচ্ছেন। কিন্তু বিধানসভায় খাদ্যমন্ত্রীর পেশ করা সেদিনের তথ্য জানাচ্ছে, এ এ ওয়াই, পি এইচ এইচ, এস পি এইচ এইচ এই তিন কার্ডের গ্রাহকরা সকলেই কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতাধীন। তাদের ২ টাকা কেজি চালের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। আর এই তিন কার্ড মিলিতভাবে সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৬ কোটি ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৪২০ জন।

অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জির সরকার দু' টাকা কেজি চাল দিচ্ছে ৭৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৩১৯ জনকে। আর বামফ্রন্ট সরকার কতজনকে দিত? তৃণমূল কংগ্রেস সরকারেরই হিসাবে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় ২ কোটি ৬৪ লক্ষ মানুষকে ২ টাকা দরে চাল দেওয়া হতো। অর্থাৎ, রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় এখনকার তুলনায় সাড়ে তিন গুণ বেশি মানুষকে নিজের খরচে ২ টাকা কেজি চাল মুখে তুলে দিয়েছিলো বামফ্রন্ট সরকার।

রাজ্যের গরিব মানুষকে ২ টাকা কেজি চাল দেওয়া শুরু করেছিলো বামফ্রন্ট সরকার। ২০০৭-০৮ সাল থেকে এরাজ্যে বি পি এল তালিকাভুক্ত মানুষের কাছে ২

টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া শুরু করেছিলো বিগত সরকার। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের কোনোও নামগন্ধ ছিলো না। তখন এরাজ্যে গরিব মানুষকে মাসে কার্ড পিছু ২ কেজি করে চাল রেশন মারফৎ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিলো।

বামফ্রন্ট সরকারের শেষদিকে ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে রাজ্যের প্রায় ২ কোটি ৬৪লক্ষ বি পি এল রেশন কার্ডের গ্রাহকদের ২ টাকা কেজি চালের যোগান দিয়ে গেছে। রাজ্যের গরিব মানুষের জন্য নিজের খরচে এই চালের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

এখন রাজ্যে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ রেশন কার্ডের গ্রাহক ২ টাকা কেজি দরে চাল পাওয়ার কথা। কিন্তু এই সংখ্যার মধ্যে ৬ কোটি ১ লক্ষ রাজ্যবাসীকেই ২ টাকা কেজি চাল যোগাচ্ছে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প। ২০১৩ সালে দেশের সংসদে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন গৃহীত হওয়ার পর থেকে দেশের সব রাজ্যের মতোই এরাজ্যও কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতাধীন। কারা জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আসবেন তারজন্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরকে দিয়ে একটি আর্থ সামাজিক সমীক্ষা করে। সেই সমীক্ষা ও কেন্দ্রীয় সরকারের বেঁধে দেওয়া সংখ্যা অনুযায়ী এরাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ২ টাকা কেজি চাল পাওয়ার অধিকারী মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ১ লক্ষ।

এই ৬ কোটি ১ লক্ষ মানুষের প্রাপ্য চালের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। রাজ্যের সরকারের দায়িত্ব একদম নেই তা নয়। খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের চালের দাম ৩ টাকা কেজি ও গমের কেজি ২ টাকা। মমতা ব্যানার্জির সরকার অবশ্য এরাজ্যে চাল ও গম ২ টাকা কেজি দরে রেশনে সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মমতা ব্যানার্জি সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে ১ টাকা ভরতুকি দিতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প আলোর মুখ দেখার আগেই এরাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ২ টাকা কেজি চালের প্রকল্প চালু করে দেয়।

তখন বামফ্রন্ট সরকারকে কত টাকা কেজি প্রতি ভরতুকি দিতে হয়েছে?

২০০৯-১০ সালে ১ কেজি চালের জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে ৪ টাকা ২৫ পয়সা ভরতুকি দিতে হতো। তখন রাজ্য বাজেটে ৫০০ কোটি খরচ ধরা থাকতো গরিবের মুখে ২ টাকা কেজি চাল দিতে।

তখন রেশনে বিভাজন ছিলো, এ পি এল- বি পি এল। এ পি এল কার্ডের গ্রাহকদের চালের দাম ছিলো ৯ টাকা ৩০ পয়সা। আর গম কিনতে হতো, ৬ টাকা ৭৫ পয়সা কেজি দরে।

সেই এ পি এল, বি পি এল বিভাজন উঠে এখন রেশনে মমতা ব্যানার্জির সরকার ‘রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা-২’ নাম দিয়ে নয়া ব্যবস্থা চালু করেছেন। কার্যত এ পি এল কার্ডের গ্রাহকদের জন্যই এই ‘আর কে এস ওয়াই-২’ কার্ড চালু করেছে সরকার।

কিন্তু চাল ও গমের জন্য দাম দিতে হবে কত?

চালের দাম কেজি প্রতি ১৩ টাকা। গমের দাম দিতে হবে প্রতি কেজি ৯ টাকা। যার অর্থ, কেজি ৩ টাকা ৭০ পয়সা বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে রেশনের চাল। গমের জন্য রাজ্যবাসীকে গুণতে হবে ২ টাকা ২৫ পয়সা বাড়তি।

ভোটের আগে ২ টাকা কেজি দরে চাল বিলি করে এখন রাজ্যের বড় অংশের গরিব মানুষকে ১৩ টাকা কেজি চালের দিকে ঠেলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। ক্ষুব্ধ মানুষ আবার নতুন করে লাইন দিয়ে চাইছেন ২ টাকা কেজি চালের অধিকার।

মানুষের ক্ষোভকে আপাতত ঠেকা দিতে আবার ফরম ফিলাপের গাজর ঝোলানো হয়েছে। কিন্তু নতুন করে আর যে কিছু হবে না বুঝিয়ে দিচ্ছেন খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরাই।

রেশন নিয়ে গরিব মানুষের সঙ্গে কার্যত প্রতারণা চলছে রাজ্যে।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের কিছু প্রকল্প

(১) থ্রি এস-সারদা

সারদা কেলেঙ্কারী ফাঁস হওয়ার পর মমতা ব্যানার্জি একটি আমানত প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন – সেফ সেভিং স্কীম। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় 'থ্রি এস'। ২০১৩-র ৫ই সেপ্টেম্বর প্রকল্পটির ঘোষণা করেন মমতা ব্যানার্জি। মুখ্যমন্ত্রীকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এখানে টাকা রেখে বাড়তি কী সুরক্ষা মিলবে? মুখ্যমন্ত্রীর জবাব ছিল, ''সরকার একটি প্রকল্প করছে মানে সরকার দায়িত্ব নিয়ে করছে। বিশেষ সুরক্ষা থাকবে।'' মুখ্যমন্ত্রীকে রক্ষা করতে সেদিন মাইক ধরেছিলেন অর্থমন্ত্রী। অমিত মিত্র বলেছিলেন,''সরকারের প্রতিশ্রুতি, সরকারের সার্বভৌম অস্তিত্ব থাকবে।''

রেজাল্ট কী? গত ৬ই জুন, ঘোষণার চার বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই নিঃশব্দে সেফ সেভিং স্কীম গুটিয়ে নিয়েছে রাজ্য সরকার। সাকুল্যে ৪ কোটির কিছু বেশি টাকা আমানত সংগ্রহ হয়েছিল। ঘোর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরাও সেই প্রকল্পে টাকা রাখেননি। মমতা ব্যানার্জির সরকারের প্রকল্পকে তাঁরাও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেননি। এই ব্যর্থতা মমতা ব্যানার্জি কোথায় রাখবেন?

(২) সমর্থন

হাল আমলের 'সমর্থন'-এও একই ফল। নোট বাতিলে বিপর্যস্ত রাজ্যে ফেরত আসা পঞ্চাশ হাজার যুবককে এককালীন ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি এই প্রকল্পে। প্রকল্প ঘোষণার পর ন' মাসের বেশি সময় পার। মমতা ব্যানার্জির সরকার ১৪,৯১০-র বেশি জনকে 'সমর্থন' করার মানুষ খুঁজে পায়নি।

(৩) কর্মতীর্থ

এমনই একটি প্রকল্প 'কর্মতীর্থ'। যদিও প্রকল্পটি অভিনব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মাল্‌টি সেকটোরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এম এস ডি পি) মূলত সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য নির্দ্ধারিত। সেই প্রকল্পের টাকায় প্রতিটি ব্লকে দোকান বানিয়ে স্বনির্ভর হতে চাওয়া ব্যক্তিদের দেওয়ার কথা। এই ক্ষেত্রে দোকানগুলির ২৫ শতাংশ সংখ্যালঘুদের জন্য নির্দিষ্ট। দোকানগুলি বানানোর কাজ অনেক জায়গাতেই শেষ হয়েছে। কারণ ইঁট, বালি, চুন, সুরকি, লোহা, সিমেন্টের কাজে এই সরকার এবং শাসক দলের নেতাকর্মীদের বিশেষ আগ্রহ। কিন্তু দোকান বন্টনের কাজ করে উঠতে পারেনি সরকার। যদিও সেটিই আসল কাজ। আর যেখানে বন্টনের কাজ হয়েছে, সেখানে বাজার নেই বলে দোকানই খোলেননি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।

(৪) যুবশ্রী-এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক

আর একটি প্রকল্প 'যুবশ্রী'। সরকার এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক বানিয়েছে। তাতে নাম লেখানো ১লক্ষ যুবককে মাসে দেড় হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রকল্পই যুবশ্রী। কারা টাকা পাচ্ছে, তাঁদের কতজন মার্কামারা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী, এই আলোচনার দরকার নেই। ধরেও নেওয়া যাক যে, যাঁরা মাসে মাসে ওই টাকা পাচ্ছেন, তাঁরা সবাই উপকৃত হচ্ছেন। সেই সংখ্যা সাড়ে ছ' বছরে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৬২৪ জন। মানে? প্রতিবছর ১ লক্ষ করে পেলে ছ' বছরে ছ' লক্ষ হওয়ার কথা। হয়নি। কারণ, যাঁরা যুবশ্রী পাচ্ছেন, তাঁরা কাজ পাচ্ছেন না। এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নাম লেখানো ২৩ লক্ষ ৯ হাজারের বেশি যুবকদের প্রায় কেউই কাজ পাচ্ছেন না। ফলে সরকার নতুন কাউকে দিতে পারছে না। যুবশ্রীর তালিকা এগোচ্ছেই না।

মমতা ব্যানার্জির এই প্রকল্পের হাল হকিকৎই বুঝিয়ে দিয়েছে – রাজ্যের যুবকদের জন্য কাজের বন্দোবস্ত তাঁর সরকার করতে পারেনি। তিনি বিলকুল ব্যর্থ।

(৫) শিক্ষাশ্রী

মমতা ব্যানার্জির ঘোষিত আর একটি প্রকল্প শিক্ষাশ্রী। তফসিলী জাতি এবং আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য চালু পুরোন তিনটি প্রকল্পকে জুড়ে নাম দেওয়া হয়েছে শিক্ষাশ্রী। তিনটি প্রকল্প হলো বুক গ্রান্ট, মেন্টেনেন্স চার্জ এবং আদার কমপালসারি চার্জ। এর মধ্যে তৃতীয় প্রকল্পটিই শুধুমাত্র আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য। ফলাফল কী? এর ধাক্কায় সরকারী ভাতা পাওয়ার সুযোগ হারিয়েছেন অন্তত ১০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী। এখন শিক্ষাশ্রী প্রকল্পের আওতায় আছে প্রায় ১৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী। কিন্তু ২০১০-১১-তে শুধু বুক গ্রান্ট প্রকল্পের আওতাতেই ছিলেন ২৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৫৬ জন তফসিলী জাতির কিংবা

আদিবাসী ছাত্রছাত্রী। ২০১০-১১-তে মেনটেনেন্স চার্জ পেয়েছিলেন ৫ লক্ষ ছাত্র। আর আদার কমপালসারি চার্জ পেয়েছিলেন ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৭১ জন।

অর্থাৎ নতুন নাম হয়েছে, বাদ অন্তত গরিব পরিবারগুলির ১০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী।

(৬) সাইকেল বিলি

মমতা ব্যানার্জি প্রকল্পগুলি নিজের ছবি ছাপানো, ভাবমূর্তি উজ্বল করার জন্য ব্যবহার করেছেন। তাও করেছেন রাজ্যের ক্ষতি করে। উদাহরণ – 'সবুজ সাথী।' সাইকেল দেওয়ার প্রকল্প এটি। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে চালু। কিন্তু সেটি এখানে বড় কথা নয়।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এখনও পর্যন্ত ২৫ লক্ষ সাইকেল কিনেছে। আরও ১৫ লক্ষ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিলি করবে। সাইকেলের বরাত পেয়েছে চেন্নাইয়ের একটি, লুধিয়ানার দুটি সংস্থা। রাজ্যের সাইকেল তৈরির সঙ্গে জড়িত সংস্থাগুলি যন্ত্রাংশ সরবরাহে কিছু সুবিধা চেয়েছিল। ২০১৬-তে টেন্ডার প্রক্রিয়া চলাকালীন একটি সংস্থার প্রস্তাব ছিল, অন্তত অর্দ্ধেক পরিমাণ সাইকেলের টায়ার এবং টিউব যাতে রাজ্যের স্থানীয় উৎপাদন সংস্থা সরবরাহ করতে পারে, তা নিশ্চিত করা হোক। আর একটি সংস্থার প্রস্তাব ছিল, যারা সাইকেল সরবরাহের প্রস্তাব পেল, সেই সংস্থাগুলি যাতে রাজ্যের স্থানীয় সংস্থাগুলির থেকে যন্ত্রাংশ কেনে তা দেখুক সরকার। টেন্ডার ডকুমেন্টে এমন শর্ত অন্তর্ভুক্ত হোক। রাজ্য সরকার এই দুই প্রস্তাবই নাকচ করে দিয়েছে। সাইকেল বিলি করে মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার হয়েছে। কুড়ুল পড়েছে রাজ্যের সংস্থাগুলির মাথায়।

(৭) কন্যাশ্রী-আগে পরে

সরকারী প্রকল্পটি ছিল মাসে ১০০ টাকার। অর্থাৎ বছরে ১২০০ টাকা জমা হত ছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে বামফ্রন্টের সময়ে। সেটিই হঠাৎ হয়ে গেছে বছরে ৭৫০ টাকার। অর্থাৎ মাসে ৬৩ টাকা ৫০ পয়সার!

রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের নথী জানাচ্ছে মাসে মাসে স্কুল ছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে ১০০ টাকার প্রকল্পটি চালু আছে। সেই প্রকল্পটির নাম – 'ইনসেনটিভ স্কীমস ফর গার্লস স্টুডেন্টস'। ২০০৮-'০৯-এ এই প্রকল্পটি চালু হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। তখন বামফ্রন্টের সরকার ছিল। 'কন্যাশ্রী'-র মতই প্রকল্পটি অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য। মমতা ব্যানার্জি নামকরণ করতে ভালোবাসেন। তিনি প্রকল্পটির নাম দিয়েছেন 'কন্যাশ্রী'। নাম পাল্টেছে, প্রচুর বিজ্ঞাপন, প্রচার হয়েছে। কিন্তু আসলে টাকার পরিমাণ কমানো হয়েছে। আগের প্রকল্পটির টাকা বাড়িয়ে চালিয়ে গেলে ছাত্রীদের সুবিধা আরও বেশি হত।

(৮) মার খেলো অন্য ভাতাগুলি

কন্যাশ্রীর জন্য অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। উদাহরণ সংখ্যালঘুদের প্রি ম্যাট্রিক এবং পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ।

তিন বছরে রাজ্যে প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপে ভাতা প্রাপকের সংখ্যা ১৩ লক্ষ কমে গেছে। এই প্রকল্পে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়া একজন ভর্তির সময় ৫০০ টাকা পায়। এছাড়া টিউশন ফি বাবদ প্রতি মাসে ৩৫০ টাকা পায়। যারা ছাত্রাবাসে থাকে তারা এছাড়াও প্রতি মাসে ৬০০ টাকা পায়। যারা বাড়ি থেকে স্কুলে যাতায়াত করে তারা, বছরের দশ মাস পায় ১০০ টাকা করে মাসে। এই প্রকল্পে প্রথম শ্রেণীর থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ারা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির সময় ৫০০ টাকা পাওয়া যায়। এছাড়া দশ মাস ১০০ টাকা করে পায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। যে কোনও পর্বেই কন্যাশ্রীর থেকে বেশি টাকা পাওয়া যায় এই ভাতায়। তাহলে এই ভাতা প্রাপকের সংখ্যা কমানো হবে কেন?

কী হারে এই প্রকল্পের আওতায় থাকা ছাত্রছাত্রী কমেছে? ২০১৩-১৪-তে রাজ্যে ওই ভাতা পেতেন ১৮,৬৯,১৬১ জন। ২০১৬-১৭-তে এই সংখ্যাটি এসে দাঁড়িয়েছে ৫,১৬,৫২৫-এ। অর্থাৎ দু' বছরের মধ্যে কমেছে ১৩ লক্ষের কাছাকাছি। অথচ সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম এই সংখ্যা উত্তোরোত্তর বাড়বে। পশ্চিমবঙ্গ উল্‌টো পথে হাঁটছে। পোস্ট ম্যাট্রিক পর্যায়েও তিন বছরের মধ্যে ১, ৯৫,৩৩১ থেকে ভাতা প্রাপকের সংখ্যা নেমে এসেছে ৭১,৯২১-এ হাজারে। এই সময়ের মধ্যে কমেছে আদিবাসীদের ভাতাও। মমতা ব্যানার্জির প্রকল্পের জন্য ক্ষতি হলো ছাত্রছাত্রীদের।

সারদার ক্ষতিপূরণেও চালাকি!

সারদা কেলেঙ্কারীর প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে বলেছিলেন 'যা গেছে, তা গেছে।' পরে ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীদের জন্য পাঁচশো কোটি টাকার তহবিল তৈরির ঘোষণা করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু আদপে দিয়েছিলেন ১৪৮ কোটি টাকার।

টাকা ফেরতের জন্য একটি কমিশন তৈরি হয়। কিন্তু সেই কমিশনকে সরকার ৫০০ কোটি টাকা দেয়নি। দিয়েছিল ২৮৬ কোটি টাকা। ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪৩৫ টি চেক ইস্যু করা হয়। তার মোট পরিমাণ ২৫১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, বন্ধ হওয়ার সময় কমিশনের কাছে ছিল বাকি প্রায় ৩৫ কোটি টাকা। কিন্তু ওই ২৫১ কোটির মধ্যে প্রায় ১০৩ কোটি টাকা বিলিই হয়নি। মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পর সেই চেক বিলি হওয়ায় সেগুলি ফেরত আসে। অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্থরা শেষ পর্যন্ত ওই টাকা পাননি। এই না বিলি হওয়া টাকার পরিমাণ ১৩৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। তা জমা রয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সমৃদ্ধি ভবন শাখায়। এছাড়া সারদার সম্পত্তি বিক্রী করে পাওয়া আরও ২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকাও রয়েছে ওই অ্যাকাউন্টে।

অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জির সরকারের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে মাত্র ১৪৮ কোটি টাকার – ৫০০ কোটি টাকা নয়। উল্টে চিটফান্ডগুলির ক্ষতিপূরণের জন্য বরাদ্দ টাকার প্রায় ১৪০ কোটি টাকা আবার সরকারের ঘরেই ফিরে গেছে।

কাজ নেই কোথাও

মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি দাবি করেছেন গত ছ' বছরে তিনি ৮১ লক্ষ চাকরি দিয়েছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে মোট বুথ ছিল ৭৭,২৪৭টি। অর্থাৎ বুথপিছু ১০৫ জনের চাকরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, গত ছ' বছরে।

তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও কর্মী, নেতা তাঁর নিজের বুথে ১০৫ জনের চাকরি হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন না। কী করে হবে? সরকারী ক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। নিয়োগ যা হচ্ছে তা মূলত অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, অফিসারদের। এছাড়া কৃষি ক্ষেত্রে লাগাতার কাজ কমছে। ছোট, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পেও কাজের সুযোগ পশ্চিমবঙ্গে কমেছে। এর একটি বড় কারণ রাজ্যে গত ছ' বছরে বড় শিল্প হয়নি।

(১) সরকারী ক্ষেত্রে চাকরির হাল

বইটির নাম 'স্টাফ সেনসাস'। বইটি চূড়ান্ত হয়েছিল ২০১৬-র ১১ই মার্চ। বইটি তৈরি করেছে রাজ্যের পরিসংখ্যান ও প্রকল্প রূপায়ণ দপ্তর। দায়িত্বে ছিল সরকারের ব্যুরো অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিকস অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস। বইটিতে সরকারী ক্ষেত্রে ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫-তে শূন্যপদের হাল নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আর এই তুলনামূলক আলোচনা জানাচ্ছে – সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা ১৯৮০-র থেকেও তা কম। রাজ্যে এখন এক লক্ষ মানুষের মধ্যে ৩৪২ জন সরকারী কর্মচারী। ২০০৭-এ ছিল ৪২২ জন। ২০১৩-১৪-তে রাজ্যে সরকারী কর্মচারী ছিলেন ৩,৫৩,৫২৫ জন। ২০১৪-১৫-তে তা নেমে এসেছে ৩,৩১,২৪৯ জনে। আর ২০০৭-০৮ রাজ্যে সরকারী কর্মচারী ছিলেন ৩,৬৫,২৭৬ জন।

গত একবছরে যে বাইশ হাজারের কাছাকাছি সরকারী কর্মচারী মমতা ব্যানার্জি কমিয়েছেন, এর মধ্যে সর্বাধিক, প্রায় দশ শতাংশ কমেছে গ্রুপ ডি পদে। সংখ্যায় প্রায় ২৫০০। সংখ্যার বিচারে সবচেয়ে বেশি কমেছে গ্রুপ সি পদের কর্মী – প্রায় ১৩ হাজার।

কমেছে সংখ্যালঘু, তফসিলী জাতি, আদিবাসী সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা।

(২) কমেছে ছোট শিল্প

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক সমীক্ষা রিপোর্ট পরিকল্পনা দপ্তরের অফিসাররা পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে। রিপোর্ট জানাচ্ছে – ২০১২-তে রাজ্যে রুগ্ন ছোট-ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ছিল ৮৮১৬। ২০১৩-র শেষে তা দাঁড়িয়েছে ১১৭৩৭। সর্বশেষ হিসাবে,

২০১৫-র মার্চে রাজ্যে রুগ্ন ছোট, ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৯,০৪১। কাজের একটি বড় ক্ষেত্র এই শিল্প। তা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। সেখানেই রুগ্নতা। কাজ কোথায়?

(৩) বিনিয়োগের দেখা নেই

২০১৪-র আগস্টে মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুরে গেছিলেন 'বিনিয়োগ খুঁজতে'। তিনি লন্ডন গেছিলেন ২০১৫-র ২৬শে জুলাই। ফিরে এসেছিলেন ৩০শে জুলাই। আবার ২০১৬-র সেপ্টেম্বরে মুখ্যমন্ত্রী জার্মানি গিয়েছিলেন সেই বিনিয়োগের লক্ষ্যে। ২০১৫-র জুলাইয়ে লন্ডন সফরে তাঁর রাস্তায় হাঁটার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল রাজ্যের সংবাদপত্রে।

২০১৭-র শিল্প সম্মেলনে মোট ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৯০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে বলেও দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৬-য় তাঁর ঘোষিত এই পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার ২৫৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। যদিও সরকারী নথী জানাচ্ছে, ২০১৬-১৭-তে রাজ্যে মাত্র ৪৬৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রাথমিক চুক্তি সই হয়েছে। সই হলেই তা বিনিয়োগ হবে, তার অবশ্য কোনও নিশ্চয়তা নেই। সেই চুক্তিগুলির ভিত্তিতে আশা করা যায় যে, ওই ৪৬৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হলে, কারখানা হলে, উৎপাদন শুরু হলে ১২,৮২৩ জনের কাজ হতে পারে। সারা দেশে যত কাজ হতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের কাজের সম্ভাবনা তার ১.০০ শতাংশ। কাজের সম্ভাবনার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ দেশে ১৩তম।

(৪) কাজ কমছে বড় শিল্পে

চলতি বছরের ২৪শে জুন দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক প্রকাশিত নথীটির নাম – 'হ্যান্ডবুক অব স্ট্যাটিসটিক্স অব ইন্ডিয়ান স্টেটস, ২০১৬-১৭'। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে দেশের রাজ্যগুলির অর্থনীতির হাল হকিকৎ তুলে ধরা এমন নথি প্রথমবার প্রকাশিত হয় গত বছর। এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। চারজন শীর্ষস্থানীয়দের একটি গবেষক দল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইকনমিক অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ বিভাগের মুখ্য উপদেষ্টা ড. বি এম মিশ্রর তত্বধানে এই নথিটি তৈরি করেছেন। সেই নথি অনুসারে ২০০৭-০৮-এ রাজ্যের বড় শিল্পগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪,২১,২৮০। ২০০৮-০৯-এ ছিল ৪,৪৯,৮৮৭। ২০১০-১১-তে তা গিয়ে পৌঁছোয় ৫,১৩,৯৭৫-এ। পাটিগণিতই বলে দিচ্ছে তিন বছরের মধ্যে শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছিল প্রায় ১লক্ষ। তা ২০১৪-১৫-তে নেমে এসেছে ৫,০৪,১৪৮-এ। সংখ্যাটি আরও নামছে।

বেহাল স্বাস্থ্য

মুখ্যমন্ত্রী অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে জেলায় জেলায় মাল্টি স্পেশালিটি বা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যত সেগুলি বেকার। নীল

সাদা রঙের বিল্ডিং তৈরি করে কিছু ঠিকাদারকে টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসকদের অভাবে ধুঁকছে সেগুলি। অবসরের মুখে কিছু চিকিৎসককে সেখানে পাঠিয়ে কাজ করতে বলছে প্রশাসন। শুধু তাই নয়, জেলা মহকুমা হাসপাতাল বা গ্রামীণ হাসপাতালের কয়েকটি বিভাগকে সেই সব আধা তৈরি হওয়া বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছে মমতা ব্যানার্জির সরকার। সরকারের ওষুধ কেনার নাকি টাকা নেই। অথচ বড় বড় বিজ্ঞাপণে ছয়লাপ হচ্ছে চারদিকে। ঝকঝকে গেট তৈরি হচ্ছে হাসপাতালে। কিন্তু স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে যা বোঝায় তা কতটা অমিল তা বোঝা গেছে ডেঙ্গু আক্রমণের সময়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা গাইঘাটায় যখন ডেঙ্গুতে মানুষ মরছে, তখন রোগীদের ন্যূনতম রক্তপরীক্ষার ব্যবস্থাও সেখানে অমিল ছিলো। রক্তপরীক্ষার জন্য বারাসতে আসতে হতো। এমনই বেহাল দশা গ্রামীণ স্বাস্থ্যক্ষেত্রের। সবচেয়ে ভালোভাবে যারা এই ত্রুটিগুলি দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে চিকিৎসকরাও রয়েছেন। আন্তরিকভাবে চিকিৎসার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্রেফ পরিকাঠামোর অভাবে মানুষকে চিকিৎসা দিতে না পেরে সোস্যাল মিডিয়াতে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন ডা. অরুণাচল দত্তচৌধুরী। এই 'অপরাধে' স্বাস্থ্যদপ্তর তাঁকে সাসপেন্ড করে দিয়েছে। কিন্তু ডেঙ্গু মোকাবিলার যে পরিকাঠামোগত অভাবের দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে তার কোনো সমাধান করা হয়নি।

স্বাস্থ্যখাতে তৃণমূল সরকার প্রকৃতপক্ষে বাজেট বরাদ্দ কমাচ্ছে। ২০১৪-১৫ সালে স্বাস্থ্য বাজেটে খরচ হয়েছে ২৬২৫.৭৪ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ সালে বরাদ্দ কমে হয়েছে ২৫৮৮.৯০ কোটি টাকা। গত সাড়ে চার বছরে সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কী ছিল আর কী হয়েছে, তা সাম্প্রতিক একটি সরকারী পরিসংখ্যান তত্ত্বেই প্রকাশ পেয়েছে। রাজ্যের স্টেট ব্যুরো হেলথ ইন্টেলিজেন্স (২০১৩-১৪) সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ২০১৫ সালে। এই রিপোর্টে বলছে শিশু মৃত্যুর হার বেড়েছে রাজ্যে। ২০১০ সালে প্রতি ১ হাজারে গ্রামে শিশু মৃত্যু হয়েছিল ৩২ জনের। ২০১২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩৩। শহরে ২৫ থেকে তা দাঁড়িয়েছে ২৬। অন্যদিকে অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস অব ইন্ডিয়া ২০১৩ সালের (বেসড অন রেজিস্ট্রেশন) রিপোর্ট বলছে ২০১০ সালে ১১,৯৮৮ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ২০১৩ সালে তা হয়েছে ১৮,৯৯২। অর্থাৎ রাজ্যে শিশু মৃত্যু বেড়েছে। ঠিক তেমনই বেড়েছে সাধারণ ভাবে মৃত্যুর হার। ২০১০ সালে প্রতি ১ হাজার জনের হিসাবে মৃত্যুর হার ৬.০ শতাংশ। ২০১৩ সালের হিসেবে তা দাঁড়িয়েছে ৬.৪ শতাংশ।

পরিসংখ্যান আরো বলছে, রাজ্যের হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে অনেকটাই কমে গিয়েছে ছানি অপারেশন। ২০১০ সালে ছিল ১০২.৪ শতাংশ। ২০১৩ সালে তা কমে গিয়ে হয়েছে ৬৫.৮ শতাংশ। ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সালে লক্ষ্যমাত্রার সাফল্য

কমেছে ২৫ থেকে ৩৫ শতাংশ। ডেঙ্গুতে মৃত্যুর হার বেড়েছে, ২০১০ সালে কলকাতায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩৭ জন। সেখানে ২০১২ সালে আক্রান্ত ৩৩৬১ জন। ওই বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। অ্যাকিউট এনকেফেলাইটিসে ২০১২ সালে মৃত্যু নেই। কিন্তু ২০১৩ সালে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। জাপানি এনসেফেলাইটিসে পুরুলিয়ায় ২০১৩ সালে ৬১ জন আক্রান্ত। অথচ ২০১২ সালে কিছু ছিল না। উত্তর দিনাজপুরে আক্রান্ত ১৫১ জন। সেখানে ২০১২ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩। শিশুদের ভিটামিন এ ডোজ (যার অভাবে রাতকানা রোগ হয়) ২০১০-১১ সালে ছিল ১০০ শতাংশের ওপর। ২০১৩ সালে তা কমে ৫৮.৩৯ শতাংশ। টিউবেকটমি ২০১০-১১ সালে ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৫৭ জনের তুলনায় ২০১৩-১৪ সালে কমে ২ লক্ষ ৭ হাজার ৪৮২ হয়েছে।

২০১৭ সালের জুন মাসে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের থেকে পাওয়া একটি তথ্যে থেকে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের ৬৬টি ব্লাড ব্যাঙ্কের মধ্যে মাত্র ৮টি নতুন লাইসেন্স পেয়েছে। ১২টি র লাইসেন্স রিনিউ হয়েছে। এছাড়াও ১২টি ব্লাড ব্যাঙ্কের লাইসেন্স পাওয়া বাকি রয়েছে। সরকারী হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির পরিকাঠামোগত অভাবের কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে মহকুমা ও প্রস্তাবিত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল দুই-ই রয়েছে। যেমন ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের পরিকাঠামোই তৈরি হয়নি। তেমনই সমস্যা রয়েছে নয়াগ্রাম হাসপাতালেও। গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আবার অভিজ্ঞ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (এম টি ল্যাব) নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সামগ্রিক অবস্থার জন্যই ক্রমশই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারাচ্ছেন মানুষ। কোথাও সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব, কোথাও নার্সিং ব্যবস্থার ত্রুটি। রয়েছে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব। অবহেলাজনিত কারণে মৃত্যু বাড়ছে। ২০১৫ সালে রাজ্য সরকারের প্রকাশিত একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের প্রায় ৩২০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই কোনো চিকিৎসক। প্রায় ১৫০ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের পদ শূন্য। আরো ভয়াবহ তথ্য হলো জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার পদ খালি ছিল প্রায় ১২৬৯টি। রাজ্য সরকার এই পরিস্থিতিতে গ্রামীণ সরকারী স্বাস্থ্যপরিকাঠামো উন্নত করার বদলে বেসরকারী উদ্যোগীদের স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসার সুযোগ করে দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে অ্যাপোলো হাসপাতালের মতো বৃহৎ কর্পোরেট হাসপাতালের বিরুদ্ধে মুখে অনেক বিষোদগার করছেন। কিন্তু সরকারী স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে সংকুচিত করে গ্রামের মানুষকে বাধ্য করছেন বেসরকারী হাসপাতালমুখো হতে। দূর দূর জেলা থেকে মানুষ কঠিন জটিল রোগাক্রান্ত হয়ে এস এস কে এম হাসপাতালের মতো উন্নত হাসপাতালের ভর্তির আশায় লাইন দিয়ে বসে থাকছেন, শয্যা পাচ্ছেন না। আর

শাসকদলের বিধায়কের নির্দেশে সেই হাসপাতালে মানুষের ডায়ালিসিস যন্ত্রে কুকুরের ডায়ালিসিস করানোর চেষ্টা হচ্ছে।

শিক্ষার সুযোগ কমছে

(১) শিশু শিক্ষা কেন্দ্র কমেছে

প্রধানত প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু হয় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (এস এস কে)। রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের অধীন শিশু শিক্ষা মিশন এই দুটি কেন্দ্র চালায়। প্রথম থেকে চতর্থ শ্রেণি পর্যন্ত প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে পাঠ্যক্রম রয়েছে সেই পাঠ্যক্রমের সঙ্গেই সঙ্গতি রেখেই পড়াশুনা হয় এই কেন্দ্রগুলিতে। বর্তমানে এস এস কে-এর সংখ্যা ১৫ হাজার ৮৭৮টি। এই কেন্দ্রগুলিতে ১১লক্ষ ৩৪হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। এইসব কেন্দ্রের শিক্ষকদের 'সহায়ক' এবং শিক্ষিকারা 'সহায়িকা' নামে পরিচিত। মোট ৪৫ হাজার ২০১ জন সহায়ক ও সহায়িকা এই কেন্দ্রগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকা। এই কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাসিক বেতন ৫ হাজার ৪০০ টাকা। তৃণমূল সরকার আসার পর ২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এস এস কে থেকে স্কুলছুট হয়েছে। এমনকি গত ৬বছরে সরকার ২৬৫টি এস এস কে বন্ধ করে দিয়েছে।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র

উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমতুল্য মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র বা এম এস কে চালু হয় ২০০৩ সালে। বর্তমানে এম এস কে-এর সংখ্যা ১৯১১টি। এখানে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হয়। বর্তমানে এম এস কে-এ'তে ৩ লক্ষ ২৩ হাজার ২৮ জন পড়ুয়া পড়াশুনা করে। এস এস কে এবং এম এস কে-এর মোট পড়ুয়ার মধ্যে ৩৮.২০ শতাংশ মুসলিম, ২৮.৭০ শতাংশ তফসিলি জাতি এবং ১১.৭৩ শতাংশ আদিবাসী পরিবারের ছেলেমেয়েরা রয়েছে। আবার মোট পড়ুয়ার মধ্যে ৫৫ শতাংশই ছাত্রী। এম এস কে-এর সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের 'সম্প্রসারক' ও শিক্ষিকাদের 'সম্প্রসারিকা' বলা হয়ে থাকে। মোট ৯ হাজার ১৭৬ জন সম্প্রসারক ও সম্প্রসারিকা যুক্ত এম এস কে'তে। সম্প্রসারক, সম্প্রসারিকাদের মাসিক বেতন ৮ হাজার ১০০ টাকা। গত ৬ বছরে এস এস কে থেকে ৭৫ হাজার ছেলেমেয়ে স্কুলছুট হয়েছে।

(৩) বেতন বৈষম্য

ত্রিপুরায় একজন এম এস কে শিক্ষকের বেতন ২১ হাজার ৯৩৩ টাকা। বিহারের এম এস কে শিক্ষকরা পান ১৯ হাজার ৩০০ টাকা। আর, রাজ্যের এম এস কে শিক্ষকদের বেতন মাত্র ৮ হাজার ৫০০!

ত্রিপুরা, বিহারের এস এস কে, এম এস কে'গুলি একটি পর্ষদের অধীনে এনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বাড়ানো হয়েছে। মমতা ব্যানার্জির সরকার তা করেনি। বেতন বাড়ানো দূরঅস্ত, এস এস কে, এম এস কে'গুলিকে পর্ষদের অধীনেও আনা হয়নি।

ত্রিপুরা সরকারের নির্দেশিকা জানাচ্ছে, গ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষিকা (রাজ্যের এম এস কে শিক্ষক-শিক্ষিকা) যাঁরা কাজের ৫ বছর পূর্ণ করেছেন তাঁদের বেতন ২১ হাজার ৯৩৩ টাকা। যাঁরা ৫বছর পূর্ণ করেননি তাঁদের বেতন ১৪ হাজার ২৬০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের এম এস কে'র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এখন বেতন ৮ হাজার ৫০৫ টাকা। অন্যদিকে ত্রিপুরার আন্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষিকা (রাজ্যের এস এস কে শিক্ষক-শিক্ষিকা) যাঁরা ৫বছর পূর্ণ করেছেন, তাঁদের বেতন ১৭ হাজার ৩৫১ টাকা। যাঁরা ৫বছর পূর্ণ করেননি তাঁদের বেতন ১২ হাজার ২১১ টাকা। রাজ্যের এস এস কে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এখন বেতন পাচ্ছেন মাত্র ৫ হাজার ৬৭০ টাকা। বিহারের সমস্ত এম এস কে, এস এস কে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পে-স্কেলে আনা হয়েছে। তাঁদের বেতন শুরু হচ্ছে ৯ হাজার ৩০০ টাকা থেকে। সর্ব্বোচ্চ বেতন ৩৪ হাজার ৮০০ টাকা।

সরকারি উদাসীনতা

এস এস কে, এম এস কে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দূরাবস্থার মূল কারণ, মমতা ব্যানার্জির সরকারের উদাসীনতা। ২০১০ সালে নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছিল, কোনো পর্ষদের অধীনে এস এস কে, এম এস কে'গুলিকে একটি পর্ষদের অধীনে আনা হলে বেতন বৃদ্ধির সুবিধা পাওয়া যাবে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত জানার পর বামফ্রন্ট সরকার ২০১১ সালে রাজ্যের এস এস কে, এম এস কে'গুলিকে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে এনে একটি পৃথক পর্ষদ গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তারজন্য বাজেটে ১হাজার কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়। এ নিয়ে বিধানসভায় একটি বিলও পাশ করে বামফ্রন্ট। কিন্তু তৃণমূল সরকার আসার পর সেই বিলের কপি প্রকাশ্যে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এস এস কে, এম এস কে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চরম অপমান করেছে। এস এস কে, এম এস কে নিয়ে রাজ্যের যদি পৃথক পর্ষদ তৈরি হতো তাহলে তাঁদের কাজের সরকারি স্বীকৃতি যেমন মিলতো, তেমনি বেতন পাওয়া নিশ্চিত হয়ে যেত। এস এস কে, এম এস কে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন এখনও সিংহভাগ দেয় কেন্দ্র। তাই মাঝেমধ্যে তাঁদের বেতন যথা সময় হয় না। এমনকি দুই মাস এস এস কে, এম এস কে-এর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বন্ধ হয়ে গেছিল কেন্দ্র টাকা না দেওয়ায়। এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের সরকার এস এস কে, এম এস কে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পি এফ বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কিছুই দেয় না।

বাঁধ, চাকরি পায়নি সুন্দরবন

সুন্দরবনে ১৯টি ব্লক। সুন্দরবনে জমি অধিগ্রহণ করে পাকা বাঁধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। ২০১১-র ৪ঠা জুনে মহাকরণ থেকে সেই প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেছিলেন, সুন্দরবনে আইলা বিধ্বস্ত এলাকার বাঁধ নির্মাণের জন্য জমিদাতা পরিবারের সদস্যদের একজনকে রাজ্য সরকারী চাকরি দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছিল বামফ্রন্ট। তারপর ২০১২-র ১লা ফেব্রুয়ারি গোসাবার সভাতেও একই ঘোষণা ছিল তৃণমূল নেত্রীর মুখে। কিন্তু গত পাঁচ বছরে মাত্র ৩০ কিমি বাঁধ হয়েছে সুন্দরবনে। যদিও কেউ চাকরি পাননি।

সংখ্যালঘু উন্নয়নে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কী বলছেন? ''আমি তোষণ করব। কোটি বার করব।'' রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলমানদের খুশি করতে তিনি বলেছেন, ''এ' রাজ্যে ৩১.৯ শতাংশ মুসলিম। আমি না দেখলে তাদের কে দেখবে ?''

মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা দপ্তরের মন্ত্রী। তিনি উর্দু ভাষার প্রসারে, যতনে অত্যন্ত আগ্রহী – এমনটিই প্রচার। কিন্তু তাঁরই দপ্তর জানাচ্ছে – রাজ্যে উর্দুতে পড়াশোনা হয় এম মাদ্রাসা এখন যা, তাই ছিল ২০১১-তেও। একটিও বাড়েনি। আছে সেই ১৭-তেই।

তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলির হাল কী?

(১) সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে বিশেষ তহবিল তৈরি হবে।

ছ' বছর কেটে গেছে। আজ পর্যন্ত হয়নি।

(২) মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য বিশেষ বেতন কাঠামো গড়ে তোলা।

এমন কিছু হয়নি। বিভিন্ন মাদ্রাসায় প্রায় ৫ হাজার যুবকের চাকরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ২০১০-এ। তারপর বিধানসভা নির্বাচন চলে আসায় কাজ শেষ করা যায়নি। তৃণমূল সরকারে এসে সেই সব পদ পূরণ করেনি।

(৩) ঘোষণা ছিল – প্রয়োজনীয় মাদ্রাসা তৈরি করা হবে।

কিন্তু রাজ্যে গত ছ' বছরে মাদ্রাসা হয়েছে ৯টি। ১৯৭৭-এ রাজ্যে মাদ্রাসা ছিল ২৩৮টি। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছরে মাদ্রাসা ছিল ৬০৫টি। ২০১৭-তে তা দাঁড়িয়েছে ৬১৪-তে। অন্যদিকে ২০১৫-তে আর এস এস পরিচালিত স্কুল দক্ষিণবঙ্গে ছিল ২০৪টি। এখন ২৬১টি। ১৯৭৭-এ মাদ্রাসায় ছাত্র ছিল ৪,৩৩৮ জন। ২০১০-'১১-তে তা হয় ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার। এই সময়ের মধ্যে মাদ্রাসায় শিক্ষকের সংখ্যা ২৫৮০ থেকে ১৯,৯৯২ জন। মাদ্রাসায় শুধু মুসলিমরাই পড়েন, তা নয়। মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই কিনতে ২৫০ টাকা, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের প্রতি মাসে ১০০টাকা

করে দেওয়া শুরু হয় বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে। সব ছাত্রীর বিনামূল্যে ইউনিফর্মও সেই সময়েই দেওয়া শুরু।

২০১১-র জুলাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন ১০,০০০ আন রেজিস্টার্ড মাদ্রাসাকে অনুমোদন দেবেন। তাই এখনও পর্যন্ত তা ৫০০ পেরোয়নি। সরকারও উদ্যোগ নেয়নি।

(৪) সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে বিশেষ কমিশন করা হবে ছিল মমতা ব্যানার্জির ঘোষণা। এমন কোনও 'বিশেষ' কমিশন আজ পর্যন্ত হয়নি। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালেই ১৯৯৬-এ রাজ্যে সংখ্যালঘু কমিশন তৈরি হয়। একই সঙ্গে তৈরি হয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম।

(৫) আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির আদলে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা।

হয়নি এমন কিছু। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালেই আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সময়কালে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিতর্ক, গোলমালের সূত্রপাত।

(৬) ঘোষণা ছিল – 'সংখ্যালঘুদের কর্মসংস্থানে প্রাধান্য দেওয়া হবে। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ করবো আমরা'।

তা হয়নি। বরং সরকারী চাকরিতে সংখ্যালঘু কমেছে। ২০১৪-র এপ্রিল থেকে ২০১৫-র মার্চ – এক বছরে রাজ্য সরকারে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা ১৯,৩৪২ থেকে নেমে গেছে ১৮,৯৯১-এ। অর্থাৎ ৩৬৫ দিনে ৩৫২ জন সংখ্যালঘু মুসলিম কর্মচারী কমেছে রাজ্যে। গত এক বছরে তা আরও কমেছে। কমেছে খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ কর্মচারীও। একবছরে রাজ্যের সরকারী কর্মচারী খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ১৬৪২ থেকে ১৫৩৮-এ নেমেছে। বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে ৩৪৭৯ থেকে নেমে হয়েছে ২৭৪৯ জন। খোদ সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মূল মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেই দপ্তরে এক বছরে ২৫ জন কর্মী কমিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

(৭) সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলেছিলেন মমতা ব্যানার্জি।

কোনও ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণে কোনও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বরং যেখানে বেশি সুযোগ পাওয়া যায়, সেদিক থেকে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমিয়েছে মমতা ব্যানার্জির সরকার।

২০১০-র ফেব্রুয়ারিতে বামফ্রন্ট পিছিয়ে থাকা সংখ্যালঘুদের ও বি সি তালিকায় অন্তর্ভুক্তি শুরু হয়। তখন রাজ্যের ও বি সি তালিকায় ৬৬টি সম্প্রদায় ছিলো। তারমধ্যে ১২টি সম্প্রদায় ছিলো মুসলিম। ২০১১-র মার্চে ও বি সি তালিকায় ১০৮টি গোষ্ঠী দাঁড়ায়। তার মধ্যে ৫৩টি মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। ৯টি বৌদ্ধ এবং ১টি করে খ্রীষ্টান এবং জৈন সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী। গরিব মুসলিমদের প্রায় ৮৮ শতাংশ ও বি সি তালিকায় চলে আসে। রাজ্যের ও বি সি তালিকার মধ্যে দুটি ভাগ রাখা হয়েছে। একটি 'অধিক অনগ্রসর'।

অন্যটি 'অনগ্রসর'। অধিক অনগ্রসর অংশের জন্য ১০ শতাংশ এবং অনগ্রসর অংশের জন্য ৭ শতাংশের জন্য সরকারী চাকরিতে সংরক্ষণ চালু হয়েছে।

২০১১-য় 'অধিক অনগ্রসর' ছিল ও বি সি তালিকার ৫৫ শতাংশ। এখন 'অধিক অনগ্রসর'-এ রয়েছে ৪৬ শতাংশ। বেড়ে গেছে যেখানে কম সুযোগ, সেই 'অনগ্রসর'-র তালিকা। অর্থাৎ বেশি পিছিয়ে থাকা সংখ্যালঘুসহ ও বি সি-দের সুযোগ কমিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

(৮) সংখ্যালঘু উন্নয়নে মমতা ব্যানার্জির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ছিল ৫৬টি মার্কেটিং হাব হবে রাজ্যে। ২০১২-র অক্টোবরে ঐ হাবগুলির ঘোষণার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন সেখানে প্রায় ছাপান্ন হাজার সংখ্যালঘু ছাত্রদের কাজের বন্দোবস্ত হবে। এমন কোন কাজ এখনো শুরু হয়নি। বরং প্রতিশ্রুতিটিই বদলে গেছে। ২০১৬-র ১লা আগস্ট নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করলেন – রাজ্যে ১৮৩টি মার্কেটিং হাব হবে। তাতে ২৯০০০ সংখ্যালঘু যুবক যুবতীর কাজের বন্দোবস্ত হবে। তাঁরা ওই হাবগুলিতে স্টল পাবেন। আগের থেকে সবই কমে গেলো। যদিও এটিও হয়নি।

(৯) সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা হাসপাতালের ঘোষণা ছিল। অনেক লেখালেখিও হয়েছে এটি নিয়ে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি।

(১০) কমছে সংখ্যালঘুদের বৃত্তিঃ

রাজ্যের লিখিত রিপোর্ট জানাচ্ছে, প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাতাপ্রাপকের সংখ্যা তিন বছরে রাজ্যে ১৩ লক্ষের বেশি কমেছে। ২০১৩-১৪-তে রাজ্যে ১৮,৬৯,১৬১জন ছাত্রছাত্রী পেতেন। ২০১৬-১৭-তে এই সংখ্যাটি এসে দাঁড়িয়েছে ৫,১৬,৫২৫-এ। বামফ্রন্ট সরকারের সর্বশেষ আর্থিক বছর, ২০১০-১১-তে এই সংখ্যা ছিল ৯,১৩,০০২। অর্থাৎ ছ' বছরের মধ্যে তা কমে গেছে ৪ লক্ষের কাছাকাছি। অথচ সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম এই সংখ্যা উত্তোরত্তর বাড়বে।

শুধু এই পর্যায়েই নয়, মাধ্যমিকোত্তর পর্যায়েও সংখ্যালঘু ভাতাপ্রাপকের সংখ্যা দেদার কমেছে রাজ্যে। রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই পোস্ট ম্যাট্রিক পর্যায়েও তিন বছরের মধ্যে ১,৯৫,৩৩১ থেকে ভাতা প্রাপকের সংখ্যা নেমে এসেছে ৭১,৯২১-এ হাজারে। ২০১০-১১-তে তা ছিল ৮৭,৭৫২-এ।

(১১) মার্কেটিং হাবঃ

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে আরও অনেক প্রতিশ্রুতি তৃণমূল কংগ্রেস দিয়েছিল। যার একটিও বাস্তবায়িত হয়নি। ৫৬টি মার্কেটিং হাবে ৫৬ হাজার সংখ্যালঘু যুবকের কাজের ব্যবস্থা করবেন মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন। হয়নি। সংখ্যালঘুদের উন্নয়ণে বিশেষ কমিশনের ঘোষণা ছিল। তাও হয়নি।

(১২) সংখ্যালঘু নিবিড় এলাকায় পরিকাঠামোর হালঃ

রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরে পৌঁছোন সেই রিপোর্ট জানাচ্ছে – গত পাঁচ বছরে এম এস ডি পি প্রকল্পে রাজ্যের ৬৭টি নতুন স্কুল বাড়ি তৈরির কথা। কিন্তু তৈরি হয়েছে ৬টি। তাছাড়া চালু স্কুলগুলিতে ৫১৯৫টি নয়া ক্লাসরুম তৈরির পরিকল্পনা জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। পাঁচ বছর শেষে জানা যাচ্ছে – অতিরিক্ত ক্লাসরুম হয়েছে ২৩৬৭টি। রাজ্য সরকার জানিয়েছে ৯৬০টি ক্লাসরুমের কাজ চলছে। অর্থাৎ প্রায় ১৮০০ ক্লাসরুমের কাজ শুরুই হয়নি। আই টি আই নিয়ে মমতা ব্যানার্জি লাগাতার নিজের কৃতিত্ব দাবি করেন। কিন্তু তথ্য বলছে – গত পাঁচ বছরে ৩৩টি আই টি আই-র অনুমোদন থাকলেও রাজ্যে শেষ হয়েছে ৬টির ভবন নির্মাণ। আর ২০০৭ থেকে ২০১১-র মধ্যে ৬টির অনুমোদন ছিল। ৪টি হয়ে গেছিল। ২টি নির্মিয়মাণ ছিল। গত পাঁচ বছরে সংখ্যালঘু উন্নয়নের বরাদ্দ টাকায় পলিটেকনিক হয়েছে মাত্র ২টি। যদিও অনুমোদন ছিল ৬টির। অন্যদিকে ২০১১-র মধ্যে অনুমোদিত ৩টির কাজই শেষ হয়েছিল। অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেই মমতা ব্যানার্জির সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট।

আক্রান্ত আদিবাসীরা

শামুকতলা, রায়গঞ্জ, করণদিঘী, বালুরঘাট, গড়বেতা, ফুলিয়াসহ সাম্প্রতিক কালে অনেকগুলি জায়গায় আদিবাসী রমণীরা ধর্ষিতা হয়েছেন।

গঙ্গারামপুর, ইসলামপুর, ঝাড়গ্রামসহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের জমি দখল করা হয়েছে গত ছ' বছরে।

বনাঞ্চলের পাট্টায় জমির গড় পরিমাণ অর্ধেক হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে। ২০১১-র এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে ১৫,৮৮৩.৪৬০ একর জমির পাট্টা দিয়েছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার। ওই তিন বছরে মোট ২৭,৭৭৩টি পাট্টা দেওয়া হয়েছিল। কাগজপত্র সব তৈরি থাকা সত্বেও দেওয়া যায়নি ২১৯২টি পাট্টা। যার পরিমাণ প্রায় ৮০০ একর। সেই তিনবছরে বন্টিত জমি এবং প্রাপকদের সংখ্যার বিচারে একেকটি আদিবাসী পরিবার গড়ে প্রায় দেড় বিঘা (১.৪২৮ বিঘা) করে জমি পেয়েছিল। গত ছ' বছরে বনাঞ্চলের জমির পাট্টা পেয়েছেন ১৬,৭৭৯ জন। তাঁদের দেওয়া হয়েছে ৫১৮১.১ একর জমি। গড়ে এই সময়ে (৬ বছরে) একেকটি আদিবাসী পরিবার ০.৭৭০ বিঘা করে জমি পেয়েছে।

কমে গেছে আদিবাসী আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা। ২০০৭ থেকে ২০১১ – এই সময়কালে রাজ্যে আদিবাসী ছাত্রছাত্রী ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার থেকে ৯ লক্ষ ৪০ হাজারে পৌঁছেছিল। সরকারী রিপোর্টই তা বলছে। অথচ রাজ্য জুড়ে, বিশেষত আদিবাসী নিবিড় এলাকায় মাওবাদী, তৃণমূল কংগ্রেসের অশান্তি ওই সময়েই। তবু স্কুলে পা রাখা আদিবাসী ছাত্রছাত্রী বেড়েছিল ওই সময়ে ১ লক্ষের বেশি।

অন্যদিকে রাজ্যে ২০১৩-১৪-তে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আদিবাসী ছাত্রছাত্রী ছিল ৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭৭৯। ২০১৬-তে তা দাঁড়িয়েছে ৯ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৩৪-এ। অর্থাৎ দু' বছরের মধ্যে কমেছে ৪২ হাজারের বেশি। নেমে গেছে ২০১১-রও নিচে।

রাজ্য সরকারের রিপোর্ট অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের ১২টি জেলায় আদিবাসী ছাত্রছাত্রী কমে গেছে। আশঙ্কার হলো – আদিবাসী নিবিড় হিসাবে পরিচিত জেলাগুলিতে আদিবাসী ছাত্রছাত্রী কমছে।

আদিবাসীদের অনেক হস্টেল বন্ধ হয়ে গেছে। চালু হস্টেলগুলির একাংশকে বেসরকারী সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছে সরকার।

দেশের কোথাও আদিবাসী পরিবারের বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মাসিক ভিত্তিতে পেনশন দেওয়ার প্রকল্প বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে শুরু। ২০০৯–'১০ আর্থিক বর্ষে রাজ্যের ১ লক্ষ ২৬ হাজার জনকে এই পেনশন দেওয়া হয়। ২০১০-১১-তে দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৬৩। আশ্চর্য ঘটনা হলো তা বাড়েনি। এবং টাকা হয়ে পড়েছে অনিয়মিত।

সাঁওতালি ভাষার শিক্ষক নিয়োগ করবেন বলেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু এখনও অনেক পদ শূন্য।

তৃণমূল কংগ্রেস-বি জে পি-র বোঝাপড়া

প্রকাশ্যে কুস্তি, ঝগড়া। গোপনে বোঝাপড়া। রাজ্যে বামপন্থীদের ঠেকাতে এটিই মমতা ব্যানার্জি, নরেন্দ্র মোদীর দলের কৌশল। তা পঞ্চায়েত পরিচালনার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। আবার পঞ্চায়েত পরিচালনার নীতিতেও। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বি জে পি জোট বেঁধে পঞ্চায়েত চালিয়েছে বেশ কয়েকটি জায়গায়। উদাহরণ – মীনাখাঁর চৈতল পঞ্চায়েত। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস ৫টি, বি জে পি ৫টি, সি পি আই(এম) ৭টি এবং সি পি আই ১টি আসনে জয়ী হয়েছিল গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান পদটি নেয়। উপপ্রধান পদটি ছেড়ে দেয় বিজেপি-কে। তেমনই মীনাখাঁ পঞ্চায়েত। গত নির্বাচনে মোট ২০টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট ৯টি আসনে জিতেছিল। ২টি আসনে জেতে বি জে পি। আরো ৯টি আসনে জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির সদস্যা উপপ্রধান। তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যা প্রধান। তেমনই দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির নুরনগর পঞ্চায়েত। মোট ২২টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট জয়ী হয়েছিল ১০টি আসনে। কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল ১টিতে। তৃণমূল ৯টিতে এবং বি জে পি ২টি আসনে জয়ী হয়েছে। বি জে পি সমর্থন করে তৃণমূলকে। প্রধান হন বি জে পি-র। উপপ্রধান হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। পূর্ব মেদিনীপুরেও তৃণমূল কংগ্রেস-বি জে পি-র এই চমৎকার সহাবস্থানের উদাহরণ রয়েছে। সেখানে পাঁশকুড়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে পড়ে চৈতন্যপুর-১নং পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের মোট ১১টি আসন। বামফ্রন্ট প্রার্থীরা জিতেছিলেন ৫টি

আসনে। তৃণমূল ৫টি এবং বি জে পি ১টি আসনে জয়ী হয়। পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছে তৃণমূল। বি জে পি-র একজন মমতা ব্যানার্জির দলকেই সমর্থন করেছে।

আর একটি উদাহরণ খোদ বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের গ্রামেই। গ্রামের নাম কুলিয়ানা। বিধানসভা গোপীবল্লভপুর। সুবর্ণরেখার পাড়ে পঞ্চায়েতটি। ২০০৮-০৯'র পরবর্তী সময়ে এই এলাকাতেও তৃণমূল কংগ্রেস-মাওবাদীদের তাণ্ডব, হুমকির মুখোমুখি হয়েছিল সি পি আই (এম)। অবশ্য মাওবাদীরা তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, আর এস এস-র কিছুমাত্র ক্ষতি করেনি। ২০১১-র পর মাওবাদীরা গত। আধিপত্য পুরোপুরি নিজেদের হাতে তুলে নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কুলিয়ানায় ১০টি আসনের একটিতেও সি পি আই (এম)-কে প্রার্থী দিতে দেওয়া হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছিল। এবং তারা বি জে পি-কেও প্রার্থী দিতে দিয়েছিল। ভোটের ফল– ১০টি আসনের ৭টিতে 'দিদিভাই'-র দল জেতে। বাকি ৩টিতে 'মোদীভাই'-র দল জেতে।

গত ছ' বছরে রাজ্যে বি জে পি-র শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। শক্তি বেড়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের মত হিন্দুত্ববাদী নানা সংগঠনের। সাম্প্রদায়িক শক্তির এই তৎপরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের নীতি, পদক্ষেপ এবং দল হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা অনেকটাই দায়ী।

২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের পর মমতা ব্যানার্জির প্রভূত প্রশংসা করেছিল আর এস এস। ২০১৬-তেও তাই অক্ষুন্ন আছে। আর এস এস নিজেদের রাজ্য কমিটির মুখপত্রে (৬৮ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা)-য় প্রকাশ করে প্রবন্ধ –'কমিউনিজমের শোকযাত্রায় শাপমুক্তি বাংলার'। সেখানে লেখা হয়েছে, ''...তৃণমূলের এই জয় সম্ভব হয়েছে স্রেফ জাতীয়তাবাদী ভোটের ফলে। গত লোকসভা নির্বাচনে ১৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল বিজেপি। এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ১০ শতাংশের সামান্য কিছু বেশিতে। প্রশ্ন উঠতে পারে, একদিকে যখন জাতীয়তাবাদী কর্মকান্ডে সারা দেশের সঙ্গে বাংলাও উত্তাল, তখন তো জাতীয়তাবাদী ভোট আরও সুসংহত হওয়ার কথা। এবং এক্ষেত্রে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বিজেপিরই। কিন্তু ভোট পাটিগণিতের অঙ্ক এত সহজে মেলে না। ...জাতীয়তাবাদী ভোটাররা অনেকক্ষেত্রেই দেখেছেন যেসব জায়গায় বিজেপি দুর্বল, জেতার সম্ভাবনা ক্ষীণ, সেখানে ঢেলে তাঁরা তৃণমূলের পক্ষে গিয়েছেন। ঠিক যেমনটি হয়েছিল গত বিধানসভা নির্বাচনে।''

উপরের বক্তব্যে স্পষ্ট – ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনেও সঙ্ঘ পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষেই প্রচার করেছিল। তাই ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর উচ্ছ্বসিত আরএসএস তাদের মুখপত্রের সম্পাদকীয়তে লিখেছিল, ''অবশেষে দুঃশাসনের অবসান। গত ৩৪ বৎসর ধরিয়া বাংলার বুকের উপর ফ্যাসিবাদী দলতন্ত্রের যে জগদ্দল পাথর চাপিয়া বসিয়াছিল, রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেই পাথরকে

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে। ...ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী সরকার ও ক্যাডারদের অত্যাচারের প্রতিবাদে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহারই নেতৃত্বে তৃণমূল জোটের এই বিরাট জয়।''

গত ছ' বছরে রাজ্যে সঙ্ঘের শাখা হয়েছে প্রায় ১৬০০। বেড়েছে প্রায় বারোশোর কাছাকাছি। গত এক বছরে বেড়েছে একশোর বেশি। ভদ্রেশ্বরে খুন হওয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান, তৃণমূল কংগ্রেসনেতা মনোজ শর্মা আসলে আর এস এস-র স্বয়ংসেবক। গত ছ' বছরে সঙ্ঘের আরও কর্মীর তৃণমূল কংগ্রেসে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আবার মুকুল রায়ের মত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা হয়ে উঠেছেন বি জে পি-র থিঙ্ক ট্যাঙ্ক।

গত বিধানসভ নির্বাচনে বিজেপি, আরএসএস-র অনেক ভোট তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস-বিজেপি'র বোঝাপড়া, ভোট আদানপ্রদানের কথা আলোচিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে খড়গপুর সদর এবং ভবানীপুরের প্রসঙ্গ এসেছে। খড়গপুর সদরে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট চলে গেছে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের পক্ষে। অন্যদিকে ভবানীপুর লোকসভায় জেতা থাকলেও বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোটের একটি বড় অংশ চলে গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে। আগের থেকে অনেক কম মার্জিনে হলেও জিততে পেরেছেন মমতা ব্যানার্জি। এমন উদাহরণ আরও রয়েছে।

মমতা ব্যানার্জি 'হিন্দুত্ব'-র বিরোধী, 'মুসলমান তোষণ'কারী এই প্রচারটি সবচেয়ে বেশি করছে সঙ্ঘ পরিবার, বি জে পি। এর পিছনে একটি গভীর ভোট কেন্দ্রিক চাল আছে। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে স্পষ্ট বি জে পি-তৃণমূল কংগ্রেস বোঝাপড়া আছে। মমতা ব্যানার্জি সঙ্ঘের বেশ আস্থাভাজন।

২০০২-এ গুজরাটে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সময়ে মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় সরকারের পাশেই ছিলেন। তৎকালীন বাজপেয়ী সরকার মোদীর প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। তৃণমূল নেত্রী তখন ছিলেন দপ্তরহীন মন্ত্রী। এই সমর্থনের পুরস্কার হিসাবে ২০০৩-এ তিনি বাজপেয়ীর মন্ত্রিসভায় জায়গা পান। আর ২০১১-তে রাজ্য সরকার গঠনের সময় নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ট অমিত মিত্রকে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী করেছেন মমতা ব্যানার্জি। ২০০৩ সালের আগস্ট মাসের ঘটনা। তখন গুজরাটের গণহত্যার ক্ষত দগদগে হয়ে রয়েছে। বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য গুজরাট সরকার যখন বিদেশে ভাবমূর্তি ফেরানোর চেষ্টা করছে, তখন সবার আগে শিল্পমহলের যাঁরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিলেন বণিকসভা ফিকির সেক্রেটারি জেনারেল অমিত মিত্র। নরেন্দ্র মোদী তাঁকেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমেরিকা ইউরোপে গুজরাটের হয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করতে। এখানেই শেষ নয়। নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটের প্রচারের জন্য 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট, রিসার্জেন্ট গুজরাট'-র আয়োজক ছিলেন তৃণমূল সরকারের অর্থমন্ত্রীই।

১৯৯৮ সালের লোকসভা ভোটে জোট বাঁধলেন বি জে পি-রই সঙ্গে। তৃণমূল

কংগ্রেসের জন্মের পরেই তারা বিজেপি-র সরকারে অংশ নিয়েছিল। ১৯৯৮-'৯৯-এ অটলবিহারী বাজপেয়ীর তেরো মাসের সরকারে, পরে ১৯৯৯-এর বিজেপি সরকারেও শরিক ছিলেন মমতা ব্যানার্জি। ২০০৪-এও লোকসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপি-র সঙ্গে ছিলেন। ২০০৬-র বিধানসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জি বিজেপি-র সঙ্গেই জোট বেঁধেছিলেন। ওই বছরের ২৫শে ডিসেম্বর ধর্মতলায় অনশন মঞ্চে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে দেখা করে যান আজকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। তারপর পরও ২০০৮-এও মমতা ব্যানার্জি বিজেপি-র সঙ্গেই ছিলেন। রাজ্যে তথাকথিত 'পরিবর্তন'-র পরে মমতা ব্যানার্জিকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শটি দিয়েছিলেন বিশ্বস্ত স্বয়ং সেবক নরেন্দ্র মোদী – ''প্রথম রাতেই বিড়াল মেরে দিন।''

সংসদে 'অনুপ্রবেশ' ইস্যুতে সঙ্ঘ পরিবারের বক্তব্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হিসাবে তুলে ধরেছেন যিনি, তাঁর নাম মমতা ব্যানার্জিই। দিনটি ছিল ২০০৫-র ৪ঠা আগস্ট। লোকসভায় উপাধ্যক্ষের মুখের উপরে কাগজের তাড়া ছুঁড়ে দিয়ে অভব্যতার এক নজির সৃষ্টি করেছিলেন আজকের মুখ্যমন্ত্রী। সারা দেশ হতবাক হয়ে গেছিল তাঁর এই কান্ডে।

বিরোধী পরিচালিত পঞ্চায়েতকে বঞ্চনা

যেখানে নিজেদের জয়ের সম্ভাবনা নেই, সেখানে পঞ্চায়েত বা পৌরসভার নির্বাচন করাতেও চরম অনীহা দেখিয়েছে তৃণমূল সরকার। মেয়াদ পেরোনোর পরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসিয়ে বকলমে শাসকদল নিজেদের ইচ্ছামতো পরিচালনা করেছে। বাধ্য হয়ে আদালতে মামলা করে নির্বাচনের অধিকার আদায় করতে হয়েছে বামপন্থীদের। মেয়াদ পেরোনোর পনেরো মাস পরে নির্বাচন করা হয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের। মানুষের রায়ে পর্যুদস্ত হয়েছে তৃণমূল, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে জয়ী হয়ে বামফ্রন্ট। কিন্তু জয়ী হয়েও রেহাই নেই। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে দিনের পর দিন রাজ্য সরকারের বঞ্চনা সহ্য করে যেতে হচ্ছে। একই চিত্র শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনেও। সরকারী প্রাপ্য টাকা যা স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন সংস্থার মাধ্যমে খরচ করার কথা তা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বিরোধীদের পঞ্চায়েতকে। উন্নয়নের যে কাজ অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে সামিল হয়ে মানুষের গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত অনুসারে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করার কথা, সেই কাজ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে করতে না দিয়ে রাজ্য সরকার নিজেদের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ, এস জে ডি এ ইত্যাদির মাধ্যমে করার চেষ্টা করছে। যে টাকা শিলিগুড়ি কর্পোরেশন ও মহকুমা পরিষদের পাওয়ার কথা তা চলে যাচ্ছে মন্ত্রীর নির্দেশে পরিচালিত উন্নয়ন পর্ষদের হাতে। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত করছে।' এমন

ঘটলে তাঁকে সম্পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্য পালটা অভিযোগ করেছেন, 'সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে অর্থ যেমন রাজ্য সরকারের প্রাপ্য, তেমনি স্থানীয় সরকার হিসাবে পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলিরও অর্থ পাওয়ার অধিকার আছে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। রাজ্য সরকার কেন সেই অর্থ থেকে বিরোধীদের পরিচালিত পঞ্চায়েত পৌরসভাকে বঞ্চিত করছে?' কোনো জবাব দিতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী।

গত নভেম্বর মাসে শিলিগুড়িতে গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করে উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু সেই বৈঠকে তিনি কাদের ডেকেছিলেন? তৃণমূল পরিচালিত পৌরসভার প্রধান, তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদের সভাধিপতিদের। কিন্তু কেন ডাকেননি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাপতি এবং শিলিগুড়ির মেয়রকে? নিরপেক্ষতার দৃষ্টিকে বর্জন করে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই প্রশাসনিক স্তরে বিভাজন সৃষ্টি করে দিচ্ছেন। প্রশাসনিক অফিসারদের কাছে বার্তা পাঠাচ্ছেন যে বিরোধী পরিচালিত পঞ্চায়েত পৌরসভাকে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। এই কারণেই ডেঙ্গু মোকাবিলায় শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনকে রাজ্য সরকার সহায়তা করেনি। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এস জে ডি এ-কে। একইভাবে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বন্যার পরে ত্রাণ বিলিতে বৈষম্য করা হয়েছে। বিরোধীদের পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে কিংবা যেখানে বিরোধী সদস্য জিতেছে তেমন এলাকায় বন্যাক্লিষ্টদের জন্য ত্রিপল ও খাবার না পাঠিয়ে অমানবিকতার নজির তৈরি করেছে তৃণমূলের প্রশাসন।

সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে কীভাবে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তার আরেকটি প্রমাণ আছে। ২০১৫ সালে নির্বাচনে জিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে বোর্ড গঠন করে বামফ্রন্ট। নিয়ম অনুযায়ী জেলাপরিষদ বা মহকুমা পরিষদে নতুন বোর্ড গঠন হলে জেলা পরিকল্পনা অফিসারের আহ্বানে গঠন করা হয় জেলা পরিকল্পনা কমিটি (ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি)। কমিটির চেয়ারম্যানের পদে থাকেন জেলা বা মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি। জেলার সদর দপ্তর দার্জিলিঙে হওয়ার কারণে জেলা পরিষদের পরিবর্তে এখানে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ রয়েছে। কারণ জেলার পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের দায়িত্বে এখন জিটিএ। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পরেই দার্জিলিঙ জেলার তৎকালীন জেলা পরিকল্পনা অফিসার প্রীতম সুব্বাকে ২০১৬-র জুন মাসের মধ্যে জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তাপস সরকার। বছর ঘুরলেও বিষয়টি নিয়ে প্রীতম সুব্বা এবিষয়ে এগোনোর কোনো আগ্রহ না দেখালে ২০১৬-র ৯ই জুন তাঁকে একটি চিঠি (৮৩৫/১/(২)/এস এম পি XXXXIV-১৭) লিখে পুনরায় একটি বৈঠক ডেকে জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠনের কথা বলেন সভাধিপতি। কিন্তু কিছুই হয়নি।